কুসুম-চরিত।

হাজারিবাগ জিলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত।

ঢাকা,
আশুতোষ-যন্ত্রে
শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১০ সন।

ভূমিকা।

কুসুম আড়াই বৎসর বয়সে লেখা পড়া আরম্ভ করে। কেমন করিয়া তাহার লেখা পড়ার জ্ঞান হইল, আমরা বুঝিতে পারি নাই। সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখে। শৈশব হইতে ধর্ম্মে মতি, বুদ্ধির প্রখরতা, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা, ন্যায়পরতা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশালতা, নম্রতা, মধুরভাষা, দয়া, পরকে আপন করিবার ক্ষমতা এবং গুরু-জনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতি বিবিধগুণ পরিচিত সকলেরই মন আকর্ষণ করিয়াছে। দর্শনমাত্রেই লোকে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে। এক কথা দুইবার তাহার জীবনে কখনো বলে নাই। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তাহার প্রতিভা দর্শনে অনেকেরই বিস্ময় জন্মিয়াছে। ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার সমক্ষে হাইকোর্টের জজ মহামান্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব

বাবু তাহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাবিধ কারণে আমার বিশ্বাস, সে জগতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে আসিয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। পীড়িতাবস্থায় এবং মৃত্যু-শয্যায় সে যে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা জগতে যীশুখৃষ্ট ব্যতীত আর কাহারো জীবনে দেখা যায় না। এই জন্য জগতের মঙ্গল কামনায় তাহার জীবনের ঘটনাবলী সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিলাম।

কুসুম-জীবনের ঘটনাবলী যতদূর স্মরণ আছে, লিখিলাম। কোন সুলেখক যদি এই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গ, ইংরেজী, পার্সি, উর্দ্দু, হিন্দি কিম্বা অন্য যে কোন ভাষায় ইচ্ছা, কুসুমের জীবন-চরিত লিখেন, তবে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

কুসুমের জীবন চরিত পাঠ করিয়া যাহার মনে যে ধারণা হয়, তাহা যদি একখানা পোষ্টকার্ডে লিখিয়া তিনি আমাকে জানান, তাহা হইলে তাহার শোকাতুরা জননীর শান্তিলাভ হইবে।

অনেকে কুসুম রচিত পদ্যগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ অবস্থায়, কোন্ সময়ে কত বয়সে সেগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে যদি

কাহারও সময় নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় পদ্য ও পত্রগুলি একটুকু বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব বাবু, রঙ্গপুর জিলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার অঘোর বাবু, ভূতপূর্ব্ব পুলিষ ইন্‌স্পেক্টর গিরীন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণী, হাজারিবাগ বঙ্গ বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, আমার জামাতা যোগেশ ও বৈবাহিক পূর্ণবাবু, মিস্ হেরিয়েট বিল, বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার মার্টিন সাহেবের কন্যা এবং অন্যান্য লোকে কুসুমের জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

কুসুম-চরিত।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই সন ১২৯৫ সনের ২রা শ্রাবণ সোমবার কুসুমের জন্ম হয়। তাহার পিতৃস্বসা কমলসোণা সূতিকাঘরে ছিল। কুসুমের যখন জন্ম হয়, আমি তখন যশোহর জিলার অস্থায়ী এসেসর-ইন্‌স্পেক্টর ছিলাম। যশোহর নগরে সন্ধ্যার অল্প পরেই কুসুমের জন্ম হয়। সূতিকাগৃহেই কমলসোণা সদ্য-প্রসূতা বালিকাকে কুসুম নাম প্রদান করে। তদবধি তাহার কুসুম নামই প্রচলিত ছিল। মাসান্তে প্রসব-গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, আমি তাহাকে সুরবালা এবং তাহার প্রসূতি কিরণশশী নাম প্রদান করে। প্রথমে আমার একটি পুত্রসন্তান হইয়া মারা যায়। তাহার প্রায় সাত বৎসর পরে এই কন্যা-সন্তানটি পাইয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হয়। কুসুমের জন্মের প্রায় মাসৈক পরে আমি যশোহর জিলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকতা পদে পুনরাগমন করি। আমি স্কুল হইতে বাসায় যাইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতাম। কুসুম প্রায়ই শয়ন করিয়া থাকিত, ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা বড় প্রকাশ করিত না। আমি তাহার প্রফুল্ল মুখকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতাম :—

"মল্লিকা মালতী ফুটেছে, আর ফুটেছে কি ? আমার কুসুমকামিনী ফুটেছে আর বাকি রয়েছে কি ? আর বাকি রয়েছে কি ?"

এই কথা শ্রবণ করিয়া কুসুম হাসিয়া উঠিত এবং ওওও করিয়া ঠিক্ যেন আমার সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিত। স্কুলের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য সকলে কুসুমকে ভাল বাসিত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন কাঁদে, কুসুম সেরূপ কাঁদে নাই। সকলের সঙ্গেই কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং হাসিয়াছে। এই ভাবে দুই মাসের কিছু অধিক কাল অতিবাহিত হইল। এক দিবস তাহার পিসী উচ্ছেপাতার রস তাহাকে খাওয়াইয়াছিল। সেই রস বুকে বাঁধিয়া কুসুমের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে, সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজার সময় কুসুম, তাহার পিসীমা, প্রসূতি, পিতৃব্য লালমোহন, পিতৃব্য-পত্নী ও পিতৃব্য-পুত্র সহ আমি আমাদের কামারগাঁয়ের বাটীতে গেলাম। কামারগাঁ ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরে অবস্থিত। আমার পিতামাতা শ্বশুর ও শাশুড়ী তখন ছিলেন না। তাঁহারা আমার সন্তানের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। আমার তখন পাঁচ ভ্রাতা ও দুইটি ভগ্নী ছিল। তাঁহারা সকলেই কুসুমের দর্শনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন।

অন্নারম্ভের জন্য কুসুমকে বাড়ী রাখিয়া আমি যশোহরে গেলাম। বাটীর পত্রে জানিলাম, কুসুম আট মাস বয়সে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং হুলুধ্বনি দিতে পারে। জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধে বাড়ী যাইয়া দেখি কুসুম অনেক কথা বলিতে পারে। আষাঢ় মাসে তাহাকে নিয়া যশোহরে গেলাম। এক দিবস হামাগুড়ি দিয়া তক্তপোষের নীচে গেল এবং মিশ্রির হাড়ী ধরিয়া টান দেওয়াতে হাড়ী পড়িয়া গেল।

তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার জীবনে আর কখনও কোন জিনিষ ধরিয়া অসতর্কভাবে টানে নাই।

আষাঢ় মাসে আমি পুরুলিয়া বদলি হইলাম। তখন কুসুমকে বাড়ী রাখিয়া আমি পুরুলিয়া গেলাম। বাড়ী যাইবার সময় পথে কুসুমের জ্বর হয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই সে জ্বর সারিয়া গেল।

শারদীয়া পূজার পর কুসুমকে নিয়া পুরুলিয়া যাই। বাকুলিয়াতে তাহার একটুকু জ্বর হয় এবং এক দিবসেই সারিয়া যায়।

কুসুম পুরুলিয়ায় প্রায়ই সুস্থ শরীরে থাকিত। সেখানে সে একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি করিল। মাতৃস্তন্য পান করিবার সময় "ওক্‌কন্" শব্দ হয়; এজন্য মাতৃস্তনের নাম "ওক্‌কন্" রাখিল। স্তন্যপান করিবার ইচ্ছা হইলে বলিত "মা! "ওক্‌কন্"। দেড় বৎসর বয়সের সময় হাটিতে শিক্ষা করে। মস্তক বড় ছিল, এজন্য সাহস করিয়া পূর্ব্বে হাটে নাই। কিন্তু যে দিবস হাটিতে আরম্ভ করিল, সেই দিবসই দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময় হইতেই তাহার গল্প শুনিবার স্পৃহা হইল।

কুসুমের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন আমাদের বাসায় সকলেরই চক্ষু উঠিল। আমরা যন্ত্রণায় অস্থির; সর্ব্বদা ডাক চিৎকার করি। আমি এক দিবস বেদনায় অস্থির হইয়া বলিলাম, জীবন যায় সেও ভাল তবু এমন যাতনা সহ্য করা যায় না। কুসুমের প্রসূতি, খুড়ীমাতা, খুড়া ও জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু কুসুম চক্ষুরোগে একদিনও একটুকু অস্থির হয় নাই, কিম্বা চিৎকার করে নাই। ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইতাম। কুসুম চক্ষু মুদিয়া থাকিত এবং বলিত "চক্ষু মেলিলে ভাল লাগে না।" একটি ভিক্ষুক

সারেঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে বলিত "গোপাল রে! কি লিবি? পয়সা লিবি?" সকলেরই বোধ হইত যেন সারেঙ্গ বলিতেছে "গোপাল রে! কি লিবি? পয়সা লিবি?" এই শব্দ শুনিলে কুসুম চক্ষু মেলিত।

পুরুলিয়া স্কুলের জাম গাছে খুব বড় বড় মিষ্টি জাম হয়। এক দিবস স্কুলের দ্বারবান্ সাগর একডালা জাম আনিয়া দিল। কুসুমের কফাধিক্য-শরীর বিধায় তাহাকে মাত্র একটি জাম দিলাম। কুসুম সে জামটি খেয়ে অতি সুন্দর ভাবে দৌড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বলিল "বাবা! আমি আর একটি জাম খাব"। আমি আর একটি জাম দিলাম; তাহাতেই সে সন্তুষ্ট রহিল।

পুরুলিয়ার আমার বাসায় একটি আতা গাছ হইয়াছিল। তাহার প্রথম আতাটি খুব বড় হইয়াছিল। কুসুম বলিয়া ছিল "বাবা! এ আতাটি পাক্‌লে আমরা সবাই মিলে খাব"। কিন্তু আমাদের তদানীন্তন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া গিয়া সেই আতাটি খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন আতাটি সুপরিপক্ক হইয়াছিল। কুসুম স্বহস্তে সেই আতাটি তাঁহাকে দিয়া আসিল।

পুরুলিয়া বাস সময়ে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগকে নিয়া বর্দ্ধমান যাইতাম, এবং কুসুমের ছোট তোষকখানা সঙ্গে নিতাম। যাইবার সময় আমি বলিয়া যাইতাম "কুসুম! আমি তোমার জন্য বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার জিনিষ আন্‌ব।" কুসুম প্রফুল্লচিত্তে আমাকে যাইতে বলিত, আমি বর্দ্ধমান গেলে পর রাত্রিতে শয়নের সময় তাহার প্রসূতিকে বলিত "মা! বাবা এখন আমার তোষকে শুয়ে আছেন" আর আমার বিষয় উল্লেখ করে নাই। কিন্তু আমি যখন বর্দ্ধমান হইতে পুনঃ পুরুলিয়া গিয়াছি, কুসুম ক্রীড়াস্থল হইতে বাটী আসিয়া হঠাৎ আমাকে দেখিয়াছে, এবং বলিয়াছে "ঐত

বাবা"। তাহার কথাতেই আমার বোধ হইত, আমার কথা সদা তাহার মনে জাগরূক ছিল; কিন্তু কাহারও নিকট সে কিছু প্রকাশ করে নাই।

কুসুমের বয়স যখন আড়াই বৎসর, তখন একদিন সে আমাকে বলিল "বাবা! নসিরা বই পড়ে, আমায় একখানা বই দেও"। নসি আমার প্রতিবাসী অনাদি বাবুর কন্যা। আমি বলিলাম "দিব"। সে বলিল "না বাবা আজই দেও"। আমি তখনই একখানা শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ আনিয়া দিলাম, এবং সকাল বেলাই অ আ ইত্যাদি এবং ক, খ পড়াইলাম। বৈকাল বেলা স্কুল হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইতেছি এমন সময় কুসুম বলিল "বাবা! একটি গল্প বল্‌তে হবে"। আমি বলিলাম 'আচ্ছা বল্‌ব।' কুসুম বলিল "বাবা! গল্প বল্‌তে একটি 'গ' আছে আর একটি 'প' আছে, নয়?" আমি বলিলাম "হ্যা"। কুসুম বলিল "আর কেমন কেমন একটি 'ল' আছে?" আমি বলিলাম, "উহাকে হসন্ত ল বলে।" রাত্রিতে প্রথমে একটি গল্প বলিলাম, তাহার পর শিক্ষা দিলাম ক আকার যোগে কা, ক ইকার যোগে কি, ক উকার যোগে কু হয়। কুসুম বলিল, "বুঝেছি, ক ঋ যোগে কৃ, ক এ যোগে কে, হয়। ইহার পরই প্রথমভাগ সমস্ত পড়িল। কতক দিবস পরে একখানা দ্বিতীয়ভাগ কিনিয়া দিলাম, এবং এক দিবস যুক্ত অক্ষর কিরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা শিক্ষা দিলাম। ইহার পর আমি কখনও তাহাকে বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা দেই নাই। সে নিজ হইতেই শিক্ষা করিয়াছে। কোন বিদ্যালয়ে তাহাকে পাঠাই নাই, কিম্বা অন্য কেহ তাহাকে কিছু শিক্ষা দেয় নাই।

পুরুলিয়ায় থাকা সময় কুসুমের এক দিবস ১০৫° ডিগ্রী জ্বর হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনেই তাহা সারিয়া যায়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কুসুমকে নিয়া বাড়ী যাই। কমলসোণা রঙ্গপুরে ছিল; তাহাকেও বাটীতে আনাইয়াছিলাম। আমি গোয়ালন্দ হইতে

নৌকা যোগে বাড়ী যাই। আমাদের বাড়ীর নিকট পদ্মার স্রোতে নৌকা এমন বেগে যাইতেছিল যে তাহা একটা প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ির উপর উঠিল। নাবিকগণ কিছুতেই তাহার বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। পদ্মা সেই স্থলে ভাঙ্গিতেছিল। নৌকার তলা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং নৌকাতে জল উঠিল। কিন্তু কুসুম তাহাতে বিচলিত হইল না। আমাকে দেখিবার জন্য আমাদের কতকটি প্রজা নদীর পাড়ে দাড়াইয়াছিল। তাহারা সকলে নৌকা টানিয়া পাড়ে তুলিল।

কুসুম একদিবস তাহার প্রসূতি ও তাহার প্রসূতির মাতুলানী সহ নৌকাতে যাইতেছিল। না দেখিয়া বৃদ্ধা কুসুমের পায়ের উপর বসিয়াছিলেন। কুসুম ক্রন্দন না করিয়া বলিল "আমার পায়ে লাগে।" বৃদ্ধা অপ্রস্তুত হইয়া তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। পূজার নিমন্ত্রণের দিন অনেক লোক কুসুমের মিষ্টি কথা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে নদীয়া অঞ্চলের ভাষা খুব মিষ্টি বোধ হয়। কুসুম পুরুলিয়াতে হুগলি জেলার বালিকাদিগের সঙ্গে খেলা করিত। সেই কারণে সেও হুগলির ভাষা ব্যবহার করিত। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ কুসুমের কথা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সেই বৎসরই বড় বধূঠাকুরাণীর ও কমলসোণার মৃত্যু হয়। বধূঠাকুরাণী পীড়িতাবস্থায়ও কুসুমকে নিকটে রাখিয়া তাহার কথা শুনিতেন।

পূজার পর কুসুমকে নিয়া পুরুলিয়া যাই। আমার বাড়ীতেই জ্বর হইয়াছিল। পথে কুসুমের ও তাহার প্রসূতির জ্বর হয়। পুরুলিয়া যাওয়ার পর তথাকার এসিষ্টাণ্ট সার্জন প্রসন্ন বাবুর চিকিৎসায় কুসুম আরোগ্যলাভ করে। তাহার পর কুসুম খেলা করে ও যখন ইচ্ছা কিছু কিছু পড়ে।

পুরুলিয়া বাস সময়ে কুসুমের বক্ষঃস্থলে একটি ব্রণ হয়। এক দিবস আমি একটি স্থচির অগ্রভাগ দ্বারা ব্রণের মুখ ভেদ করিয়া সজোরে টিপ দিয়া সমস্ত পিক বাহির করিলাম। কুসুম একটুকুও কাঁদিল না; কেবল বলিল "বাবা! আমায় ছেড়ে দেও, আমি পালাবনা।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আমি রঙ্গপুরে বদ্‌লি হই। রঙ্গপুর যাইবার সময় কুসুমকে বাড়ী রাখিয়া যাই। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী যাইয়া আষাঢ় মাসে কুসুম, তাহার প্রসূতি, তাহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা জলদাকান্ত ও সতীন্দ্রমোহন, মাসতাত ভ্রাতা তেজেন্দ্রনাথ বসু এবং আমাদের প্রতিবাসী একটি ভদ্রলোক দ্বারিকানাথ দে সহ রঙ্গপুরে যাই। কুসুম বড় কুসুমপ্রিয় ছিল। সেই জন্য যে বাসায় উঠিয়া ছিলাম, সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ অন্য বড় একটি বাসায় গেলাম। তথায় ফুলের বৃক্ষ রোপণ করিলাম।

রঙ্গপুর বাস কালীন কুসুমকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "কুসুম! তুমি এত শীঘ্র পায়খানা হইতে আসিলে কেন?" কুসুম বলিল "সবটুকু প্রস্রাব হইয়াছে, আর বাহ্য হইবেনা।" আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ভাবিলাম—এই মাত্র পঞ্চমবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে নির্দ্ধারণ করিয়াছে, বাহ্যের শেষে প্রস্রাব হইলে আর মল নির্গতহয় না।

আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মথুরামোহন একদিবস বলিল "কুসুম! তোমার বাপের তুমি একমাত্র কন্যা, তোমাকে বিবাহ দিয়া তোমার বাবা ঘরে থাকিতে পারিবেন না, তোমার বিবাহ না হইল।" কুসুম বলিল "আমার বিবাহ না হইলে, আমার মা বাপ যখন বুড় হ'য়ে মর্ব্বেন, তখন আমি থাক্‌ব কার নিকট?" এই কথা শুনিয়া মথুর বিস্ময়াপন্ন হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল "ইহা তুমি

জানলে কেমন করে?" কুসুম বলিল "আমার মার ত মা বাপ মরে গেছেন; মার বিয়ে না হলে. মা এখন থাকতেন কোথা?" একদা কুসুম বহির্বাটীতে কাঁটাল গাছের নীচে মোড়ার উপর বসিয়া বঙ্গবাসী পাঠ করিতেছে, এমন সময় রঙ্গপুরের সবরেজিষ্টার বাবু বিপিনবিহারী সেয়ানবীস বলিলেন "কুসুম ক, খ, পড়েই বঙ্গবাসী পড়ছে!" একদিবস কুসুম আমার সঙ্গে ঘোড়গাড়ীতে রঙ্গপুর তাজ হাটের মহারাজ গোবিন্দলালের বাড়ী দেখিতে গেল। মহারাজ বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার দেওয়ান কুসুমকে সমস্ত বাগান, রঙ্গমহল, তোষাখানা ইত্যাদি দেখাইলেন। সোণারূপার চেয়ার, খাট ইত্যাদিও দেখাইলেন। এক প্রকোষ্ঠে একটি পাংখার ডাট কাচ নির্ম্মিত ছিল। দেওয়ান মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, কুসুম কাঁচের ডাট কখনও দেখে নাই; ইহা কিসের নির্ম্মিত তাহা বলিতে পারিবেনা। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি কুসুম! পাংখার এই ডাট খানা কিসের নির্ম্মিত?" কুসুম বলিল "কাঁচের।" দেওয়ান মহাশয় চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি এত বড় মোটা ডাট কখনও দেখেছ? কুসুম বলিল "জ্বর হইলে বগলে যে থার্ম্মমিটার দেয় তাহারই মত, এটা কিছু মোটা আর বড়"।

রঙ্গপুর বাস সময়ে কুসুমকে নিয়া আমি অনেক বড় লোকের বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। তাহার গঠনে, স্বভাবে ও চলনে এমনি লাবণ্য ছিল এবং ভাষা এমন মধুর ছিল যে, যে তাহার সহিত আলাপ করিয়াছে, সেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। ডিম্‌লার রাজা জানকীবল্লভ কুসুমের সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং আমাকে

বলিয়াছিলেন "কুসুম যেন পূর্ণলক্ষ্মী, ইহার ভাষা কেমন মধুর এবং বুদ্ধির কেমন তেজ!"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তেজেন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাহার পর দিবস কুসুম বাড়ী যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইল। প্রতিবাসী অনেকে আসিয়া কুসুমকে প্রবোধ দিল। কুসুম তেজেন্দ্রের মৃত্যুর পর দিবসই রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিল। রেলে উঠিলাম, কুসুম বসিয়া রহিল। যখন একটা নদী পার হইলাম, তখন কুসুম বলিল 'বাবা! এবুঝি একটা নদী পার হইলাম'। আমি বলিলাম, হঁ্যা। কুসুম বলিল, "তবে বোধ হয় এখন রঙ্গপুরের সীমানা ছাড়িয়েছি! এখন তবে ঘুমাই" এই বলিয়া ঘুমাইল।

বাড়ী যাইবার সময় সারা ঘাটের জাহাজ চড়ায় লাগিয়া ছিল। তাহাতে অনেক বিলম্ব হয়। দামুকদিয়া ঘাটে মেইলট্রেনে চাপিয়া আমি নিদ্রিত ছিলাম। আমাদের বাড়ী যাইতে পোড়াদহ নামিতে হয়। নিদ্রিত ছিলাম; পোড়াদহে নামিতে পারি নাই, চুয়াডাঙ্গা যাইয়া টের পাইলাম। তথায় কুসুমও তাহার প্রস্থতিকে নিয়া নামিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। তিনি কুসুমকে নিজ বাটীতে নিয়া আহারাদি করাইয়া আমার নিকট আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন "আপনার মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বাসার সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছে।" আমরা বাড়ী আসিলাম। বন্ধের পর যখন আমি বাটী হইতে যাই, কুসুম আমার সঙ্গে জাহাজঘাটা গিয়াছিল। আমি রঙ্গপুর চলিয়া গেলাম; কিন্তু কুসুমের তখনই জ্বর হইল। আমি রঙ্গপুর স্কুলে বন্ধের পর উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় টেলিগ্রাম পাইলাম, কুসুমের ১০৫° ডিগ্রী জ্বর হইয়াছে এবং সে আপনাকে দেখিতে চাহে। আমি বাটী চলিয়া গেলাম। তথায় যাইয়া

দেখি কুসুম তখন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমি তাহাকে প্রবোধ দিয়া রঙ্গপুর চলিয়া গেলাম।

জুলাই মাসে আমি বগুড়ার হেড্ মাষ্টার হইলাম। দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত কুসুম বাড়ী রহিল। বাটীতে এই তিন মাস সে জ্বর রোগে ভুগিয়াছিল। পূজার পর কুসুমকে নিয়া বগুড়া গেলাম। রাস্তায় কুসুমের জ্বর হইল। নখিলা রাজার কাচারিতে আমরা আহারাদি করিলাম। কুসুম সাগু আহার করিল। সে ফুল ভাল বাসিত। এই জ্বর, তথাপি সে বলিল "বাবা! আমায় বাগান হইতে সুন্দর সুন্দর ফুল দেও"। আমি নানাবিধ ফুল দিলাম। কুসুম আনন্দিত হইল। সেখানে এক দিবস থাকিয়া ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ নিয়া নৌকায় বগুড়া রওয়ানা হইলাম। কতক দূর যাওয়ার পর নৌকা আর চলিল না। যদি গরুর গাড়ীর ঝাকুরানিতে কুসুমের প্রাণ যায়, এই আশঙ্কায় পালকির জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই পালকি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অগত্যা গোযানে গমন করিলাম। এক দিকে আমি এবং অন্য দিকে কুসুমের প্রসূতি; অত্যন্ত পিপাসা; মধ্যে মধ্যে কুসুমকে জল দিতেছি; কখন তাহার প্রাণ বহির্গত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা ভীত। আমরা যাইতেছি, এমন সময় পথে এক বাড়ীতে প্রফুল্ল জবাকুসুম দেখিতে পাইয়া কুসুম বলিল "বাবা! আমায় একটি জবাফুল।" আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফুল দিলাম। কুসুম ফুল পাইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

বগুড়াতে যাইয়া শ্রীমন্ত ডাক্তার আর শ্রীমন্ত কবিরাজকে কুসুমের চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলাম। উভয়ে এক মত হইয়া ঔষধ দিতে আরম্ভ করিল। ১১এগার দিবস কাল কুসুম সুপ এবং দুগ্ধ-সিক্ত বার্লি-বিস্কুট আহার করিয়া জীবন ধারণ করিল। জলের পরিবর্ত্তে ছোড়া-

ওয়াটার পান করিত। এগার দিবস পরে কুসুমের জ্বর ছাড়িল এবং ঘর্ম্ম আরম্ভ হইল। ঘর্ম্ম দেখিয়া আমাদের ভয় হইল। কবিরাজ ভয়ে রাত্রিতে আসিলেন না, কেবল ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার আসিলেন এবং বলিলেন যে "কোন ভয় নাই, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন জ্বর ছাড়িবে, তখন এক খানা নেকড়ার মত হইবে।" কুসুমের প্রসূতি, মথুর, জলদা ও দ্বিজেন্দ্র এবং আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলাম। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধবটিকা কস্তুরিভৈরব সেবন করাইতে আরম্ভ করিলাম। দুই ঘণ্টা অন্তর শরীরের তাপ ৯৬° ডিগ্রীর নীচে নামিতে লাগিল, কিন্তু কস্তুরি-ভৈরব খাওয়াহইলেই আবার ৯৬° ডিগ্রীর উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। আমি মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতাম "কুসুম! কেমন আছ?" কুসুম বলিত "বেশ আছি।" এই প্রকার চিন্তায় রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে ডাক্তার ও কবিরাজ দুইজনেই উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বলিলেন "এখন আর ভয় নাই;" কিন্তু কবিরাজ বলিলেন, "এখনও নাড়ীতে গোল আছে।" কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা পরেই কবিরাজ বলিলেন "এখন নাড়ী ভাল হইয়াছে।" এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কুসুম ক্রমশঃ সুস্থ হইতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত, আর নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতাম। কুসুম অনেক দিন পর্য্যন্ত পোর্ট এবং স্কটস্ ইমালসন্ সেবন করিয়াছিল।

কুসুম সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়া বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে কখনও কোন বিদ্যালয়ে পাঠাই নাই; কিম্বা তাহাকে শিক্ষা দিতে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করি নাই। বাঙ্গালা কোন বিষয় কখনও সে আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করে নাই। নিজে বাসায় বসিয়া পড়িত এবং নিজেই তাহার মর্ম্ম বুঝিত। আমি যতক্ষণ বাসায় থাকিতাম, ততক্ষণ আমার নিকটে বসিয়া অধ্যয়ন করিত; কিম্বা খেলা

করিত। কখন কখন খেলা ঘরে ধূলি ও শাকসবজি দ্বারা ভাত, ডাইল, মাছের ঝোল, মাছ ভাজা, কপির ডাল্‌না, টক্‌, পানিতাওয়া, রসগোল্লা, সন্দেশ, সরপুরিয়া, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া মৃত্তিকার বাসনে আমার নিকট আনিত, এবং বলিত, "নেও বাবা! খাও। অনেক পদ তৈয়ার করেছি; তাই একটুকু দেরি হয়েছে। তোমার ক্ষুধা পেয়েছে, তা আমি বুঝেছি। তুমি ত আর দুইএক পদে সন্তুষ্ট হওনা, সে জন্য অনেক পদ তৈয়ার কর্ত্তে বিলম্ব হয়েছে।" কখন কখন বা রাত্রিতে আহারের পর আমার সঙ্গে শয়ন করিয়া বলিত "এস বাবা! মা-ছেলে খেলা করি।" তাহার পর আমি বলিতাম "মা! আমি একটি বর্দ্ধমানের সীতাভোগ খাব।" সে বলিত "নেও একটি সীতা ভোগ।" আমি বলিতাম, "মা! সীতাভোগে গন্ধ কেন?" কুসুম বলিত "বর্দ্ধমান যে অনেক দূরের পথ, আন্‌তে পথে একটুকু গন্ধ হয়েছে।" এইরূপ নানাবিধ মিষ্টসামগ্রীর নাম করিয়া আমার মুখের নিকট হাত আনিত। কখনও বা ঘোঁ করে শব্দ ক'রে আমাকে বলিত, "বাবা! বাঘ এসেছে; লেপের নীচে মাথা এনে চুপ ক'রে থাক।" এইরূপ নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে আমার চিত্ত-বিনোদন করিত।

এক দিবস মথুর বলিল "কুসুম! তোমার বাবা যদি তোমাকে কোন কুৎসিত বোকা ছেলের সহিত বিবাহ দেন?" কুসুম উত্তর করিল "বাবা কি আমার শত্রু?"

কুসুমের সপ্তমবর্ষ অতীত হইল। সে কখন কখন আমার সঙ্গে স্কুললাইব্রেরীতে গিয়া নানাবিধ সাহিত্য পুস্তক অধ্যয়ন করিত। পূজার পূর্ব্বে কুসুমের জ্বর হয়। প্রথমতঃ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করি।

কুসুমের পা ফুলিয়া অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল। সে বলিল "বাবা! পা নাড়িতে পারি না, অত্যন্ত বেদনা, ডাক্তারকে "ঔষধ দিতে বল।" ২২ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ যাতনা সহ্য করিল; কিন্তু এক দিনও কাঁদে নাই; কিম্বা কোনরূপ বিষাদ প্রকাশ করে নাই; অম্লানবদনে এই কঠোর যাতনা সহ্য করিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার জ্বর কিছুতেই দূর করিতে পারিল না। তাহার পর কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। কুসুম আরাম হইলে পরে তাহাকে নিয়া পূজার সময় বাড়ী গেলাম। কিন্তু বাড়ীতে পুনরায় তাহার হামজ্বর হইল, আমার সঙ্গে পূজার পর সে আসিতে পারিল না। কুসুম ও তাহার জননীকে বাড়ী রাখিয়া আমি বগুড়া গেলাম। বাড়ীতে কুসুমের কঠিন আমাশয় হইল। প্রায় মাসৈক রোগ ভোগ করিয়া কুসুম তাহার মাসতাত ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ বসু, পিসতাত ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ও তাহার জননী বগুড়া গেল।

প্রতিবার ব্যারামের পরই কুসুমের বুদ্ধির বিকাশ হইত। Thomas Dequincey says in his *Early memorials of Grasmere*, "Wonderful it is to see the effects of sudden misery, sudden grief or sudden fear in sharpening (where they do not utterly upset) the intellectual perceptions." এইবার কুসুম বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, দেবীপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমৎ-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। শব্দের অর্থ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত না। এক দিবস কুসুম স্কুললাইব্রেরীতে বসিয়া শকুন্তলা আদ্যন্ত পাঠ করিল। আমি বলিলাম "কুসুম! এই কয় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত

শকুন্তলা পাঠ করিলে? কোন শিক্ষক, এখন নাম ঠিক বলিতে পারি না, বলিলেন, "বোধ হয় কেবল পুস্তকের পাতা উল্টাইয়াছে।" আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করুন।" কুসুমকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ঐতিহাসিক গল্পটির সার অতি সহজে বলিল। শিক্ষকটি তখন বিস্মিত হইয়া কুসুমের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এক দিবস কুসুম শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জনপুরের চিত্রটি আমাকে এত সহজে ও সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, আমি তাহাতে অতীব বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই সময় হইতে কুসুম কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করে।

তাহার প্রথম কবিতা—

"করুণা-সাগর পিতঃ অখিলের পতি।
তোমার চরণ যুগে অসংখ্য প্রণতি॥
তোমার আদেশে প্রভু জনম ধারণ।
তব রাঙ্গা পদে আমি নিলাম শরণ॥"

এই কবিতা শুনিয়া আমার মনে কেমন একটা ভাবের উদয় হইল। এই মাত্র সাত বৎসর বয়স অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এ বালিকা কেমন করিয়া এ কবিতা রচনা করিল! "তোমার আদেশে প্রভু জনম ধারণ" তবে কি আমরা ঈশ্বরের নিকটে থাকি এবং তাঁহার আদেশ হইলে এজগতে আগমন করি? যদি তাঁহার আদেশে জন্মধারণ করি, তবে তাঁহারই আদেশে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমার মনে হইল কুসুমের রুগ্নদেহ, বোধহয় আমাকে প্রকারান্তরে আভাস দিল। তদবধি আমি চিন্তা করিতাম "ভগবন্! তোমার আদেশে ইহ জগতে আসিয়াছি, তোমার অভিপ্রেত কার্য্য যেন সম্পাদন করিতে পারি।

কুসুম আমার সঙ্গে সর্ব্বত্রই বেড়াইতে যাইত। আমি যখন বগুড়া জিলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলাম, তখন ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট্, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় পাবনা ও বগুড়ার সেসনজজ ও ৺রায় গোপালহরি মল্লিক বাহাদুর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আমি কুসুমকে নিয়া ইহাদের সকলের নিকটই যাইতাম এবং ইহারা সকলেই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

গোপালহরি মল্লিকের প্রথম স্ত্রীর বিয়োগ হওয়াতে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় বগুড়াতেই পুনঃ দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার নবপরিণীতা জায়া কিরণশশী অতি রূপবতী। এক দিবস কিরণশশী বলিল "কুসুম! তুমি কবিতা রচনা করিতে পার, আমার রূপ বর্ণনা কর।" কুসুম তখনই বলিল—

"কিবা অপরূপ রূপ করি দরশন।
রূপের ছটায় যেন শশীর কিরণ॥
সার্থক কিরণশশি হ'ল তব নাম।
হেরিয়া কমল মুখ পুরে মনস্কাম॥
আহা কিবা মরি রূপ ভুবন-মোহন।
দন্তপাটি যেন ঠিক মুক্তার গাথন॥
কেশগুচ্ছ যেন ঠিক বিষধর-ফণা।
হরিণ জিনিয়া হও সুচারুনয়না॥"

কিরণশশী আনন্দিত হইয়া কুসুমকে একটি টাকা পুরস্কার দিল। বহির্ব্বাটীতে আসিয়া কুসুম আমাকে টাকা দেখাইল। আমি বলিলাম "টাকা ফিরাইয়া দেও।" সে বলিল, "আমি টাকা আনিতে চাই

নাই, আমার কাপড়ে বান্ধিয়া দিয়াছে।” তাহার পর কুসুম টাকা ফিরাইয়া দিল।

এই কবিতা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নগরস্থ অনেক ভদ্রলোক বলিল, “এতটুকু মেয়ে,কোথায় এমন ভাষা পাইল?” “রূপের ছটায় যেন শশীর কিরণ।” কেমন সুন্দর ভাষা! “সার্থক কিরণশশি হ’ল তব নাম।” ইহাতে পাণ্ডিত্য আছে, তোমার রূপের ছটায় যখন শশীর কিরণ দেখিতেছি, তখন তোমার কিরণশশী নাম অর্থ যুক্ত। এইমাত্র আট বছরে পড়েছে, এ বালিকা অর্থ কেমন করিয়া ঠিক করিল। এবম্বিধ প্রশংসা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল।

এক দিবস গোপালহরি বাবু বলিলেন “কুসুম! মেমসাহেবের রূপ বর্ণনা কর্লে, আমার রূপ বর্ণনা কর; তবে ত মেমসাহেব সন্তুষ্ট হবেন।” কুসুম তখন তাহার রূপ বর্ণনা করিল—

“কিরণশশীর পতি, রূপে যেন রতিপতি
গোঁপধারী অতি মনোহর।
সুগঠিত কলেবর, কোকনদ জিনি কর,
ঠিক যেন দেব লম্বোদর॥”

এই কবিতা শুনিয়া গোপালহরি বাবু অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। বটব্যাল সাহেব সর্ব্বদাই গোপালহরি বাবুকে “গণেশপেটি” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি এই কবিতা শুনিয়া চেয়ার হইতে উঠিলেন এবং কুসুমকে ক্রোড়ে করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন “প্রসন্ন বাবু! আমার সমস্ত ছেলে মেয়ে না হ’য়ে, যদি কুসুম আমার মেয়ে হ’ত, তা হ’লে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম এবং পরম সুখী হইতাম। আপনি খুব ভাগ্যবান পুরুষ। কুসুমের যে কেবল

কবিত্ব শক্তি আছে এমন নহে, ইহার দর্শন শক্তিও অতি চমৎকার। গোপাল হরি বাবুর পেট্‌টি ঠিক গণেশের পেটের মত, ইহা ত কুসুম এই বয়সে ঠিক করেছে। হাতের তালু লাল, তাই কোকনদ সদৃশ বল্লে। আর গোপাল হরি বাবুর পরিবারের বর্ণনাতে খুব মাধুরী আছে। "দন্তপাটি যেন ঠিক মুক্তার গাথন।" কেমন সুন্দর বর্ণনা!"

এই কবিতা রচনার পর হইতে কুসুমের যশ আরো বেশী হইল। এক দিবস বগুড়ার এসিষ্টাণ্টসার্জন বাবু প্যারীশঙ্কর দাস কুসুমের কবিত্ব-শক্তি পরীক্ষার জন্য অপরাহ্ন সময়ে আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। কুসুম বহির্বাটিতে আমার নিকটে একখানা চেযারে উপবিষ্ট ছিল। প্যারী বাবু অন্য একখানা বেত্রাসনে উপবেসন করিলেন। প্যারী বাবু বলিলেন "কুসুম! আমি এক পদ রচনা করিব, তোমার অন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।" কুসুন শব্দ প্রয়োগ করিল না।

প্যারী বাবু বলিলেন—

"দুর্য্যোধন রাজা ছিল পাপেতে মগন।"

কুসুম বলিল—

"ভীমের হস্তেতে তার হইল নিধন॥"

প্যারী বাবু বলিলেন—

"রামের বনিতা ছিল জনক-নন্দিনী।"

কুসুম বলিল—

"রাবণ হরিয়া নিল পেয়ে একাকিনী॥"

প্যারী বাবু এবার স্তম্ভিত হইলেন। আমি বলিলাম "দেখুন কেবল যে আপনার কবিতার পাদপূরণ করিয়াছে, এমন নহে, ইহার সঙ্গে

সমস্ত মহাভারত ও রামায়ণের সারও ঠিক উপযুক্ত বিষয়টি বলিয়াছে। “দুর্য্যোধন রাজা ছিল পাপেতে মগন।” ইহার মিল কত অসংখ্য কবিতা দ্বারা হইতে পারে; কিন্তু তাহা না বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ‘ভীম হস্তে নিহত’ এই কথাটি বলিয়াছে। “রামের বনিতা ছিল জনক নন্দিনী।” এই কবিতার মিল কত শত কবিতা দ্বারা হইতে পারে, তাহা না বলিয়া রামায়ণের সারটুকু বলিয়াছে। আরো দেখুন শব্দগুল কেমন মিষ্টি।” প্যারী বাবু বলিলেন “সম্মুখে প্রশংসা করিবেন না। তাহাতে হয়তো ইহার অহঙ্কার হইয়া সমস্ত মাটি হইতে পারে। যাহাতে ইহার ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহারই চেষ্টা করিবেন।” কিন্তু কুসুম কখনও প্রশংসায় গর্ব্বিতা হয় নাই, আরো যেন মাটির মত হইয়াছে। প্যারীবাবুর একটি ষোড়শবর্ষীয়া দুহিতা বেশ কবিতা রচনা করিতে পারিত। প্যারীবাবু তাহার রচিত কবিতা এবং কমলিনী নামক স্বরচিত একখানা গ্রন্থ কুসুমকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

এক দিবস কুসুমের পা কুঠারে লাগিয়া অধিক পরিমাণ কাটিয়াছিল। আমি তখন স্কুলে ছিলাম। কুসুম কোনরূপ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া শীতল জল দ্বারা পা ধুইতে ছিল। তখন তাহার প্রসূতি দেখিতে পাইল এবং রক্ত দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, “সর্ব্বনাশ!” কুসুম বলিল, “মা! চুপ কর, ঠাণ্ডা জল দিলেই সারিয়া যাইবে, তুমি একটুকু পরিষ্কার নেকড়া দেও।” তাহার প্রসূতির নিকট হইতে নেকড়া নিয়া ক্ষত স্থান বন্ধন করিল এবং বিছানায় শুইয়া রহিল। শোয়ার সময় তাহার গর্ভধারিণীকে বলিল “মা! বাবাকে এবিষয় কিছু বলিও না।” যে দিবস সে স্কুলে না যাইত, সেই দিবস চারিটা বাজিলেই বহির্বাটীতে পথ মাঝে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিতাম। কিন্তু সেই

দিবস কুসুমকে স্কুলে কিম্বা পথ মাঝে না দেখিয়া শশব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিলাম এবং তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুসুম কোথায় ?" সে বলিল, "কুসুম শুয়ে আছে।" আমি বলিলাম "কেন ?" সে বলিল, "কুসুমের পা কেমন করিয়া কুঠারে কেটেছে, তাই শুয়ে আছে। তোমার নিকট একথা বল্‌তে আমায় নিষেধ করেছে।" আমি অমনি ক্ষতস্থান দেখিতে গেলাম। কুসুম বলিল, "এখন নেক্‌ড়া খুলনা, খুল্লে আবার রক্তপড়্‌বে।" আমি বন্ধন না খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"আমাকে জানাইতে নিষেধ করেছ কেন ?" কুসুম বলিল, "তুমি বল্‌বে, 'তুমি বড় অসাবধান' তাই আমি নিষেধ করেছি।"

কোন কোন দিবস সন্ধ্যার সময় কুসুম তক্তপোষের উপর নাচিত এবং গান করিত, "ও যার পাখ্‌না নেড়ে ধূল ঝেড়ে লেজ্‌টি মুড়ে যমকে মারি। ও সে প্রাণের পাখী, গুণের ঢেকি তারে কি আর ভুল্‌তে পারি।" শাইস্তা পাগ্‌লার এই গানটি কোন একখানা উপন্যাস পড়ে সে শিখে ছিল। এই গানটি এতই মধুর বোধ হইত যে, এখনও যেন সেই গানটি সময় সময় আমার কর্ণে বাজে।

সুরেন্দ্র বগুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। অঙ্ক কিছুই করিতে পারিত না। কুসুমের প্রসূতি সুরেন্দ্রকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। আমার অনেক কাজ, তাহাকে পড়াইবার আমার সময় ছিলনা, তাই আমি স্বীকার করিলাম না। সুরেন্দ্র তখন গুণ বিভাগ করিত, এবং বয়সে কুসুমের বড়। কুসুম একদিবস আমাকে বলিল, "বাবা! আমি আঁক শিখিব।" সে দুই তিন দিবসের মধ্যে যোগ,বিয়োগ, গুণ, বিভাগ শিক্ষা করিয়া সুরেন্দ্রকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।

এক দিবস পাবনা ও বগুড়ার সেসন জজ রায় সাহেব,কুসুম ও আমি ব'সে আছি, এমন সময় বটব্যাল সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন। রায়-

সাহেব বটব্যাল সাহেবকে দেখিতে পান নাই। গতিকেই অভ্যর্থনাও করেন নাই। বটব্যাল সাহেব বলিলেন, "কেদার রায়! তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার নিকটে দণ্ডায়মান; তুমি উঠিয়া এখনও আমার অভ্যর্থনা কর নাই? তখন রায় সাহেব বলিলেন, "আমি ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ, তুমি ডিষ্ট্রিক্ট্ মেজিষ্ট্রেট্, তুমি আমার নিকট আসন প্রার্থী?" বটব্যাল সাহেব বলিলেন; "আচ্ছা, তুমি বড়, কি আমি বড়, ইহার বিচার করুক কুসুম।" কুসুম বলিল—

গুরুরগ্নি র্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

ইহা শুনিয়া বটব্যালসাহেব বলিলেন, "এখন কেমন?" রায় সাহেব বলিলেন, 'এ বিচার কুসুমের নহে। কুসুমের পিতা ব্রাহ্মণদিগের রচিত একটি শ্লোক তাহাকে অভ্যস্ত করাইয়াছে; তাহাই কুসুম এখন বলিল।" বটব্যাল সাহেব বলিলেন "কুসুম আরো শ্লোক জানে, তাহা বলিল না কেন?" তখন বটব্যালসাহেব কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম! তুমি এশ্লোক এখন বলিলে কেন?" কুসুম বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ এবং অভ্যাগত, তাই বলেছি।" তখন বটব্যাল সাহেব অতীব আহ্লাদিত হইলেন এবং আমরা সকলে হাসিতে আরম্ভ করিলাম।

একদা কুসুম বলিল, "বাবা! যত উপন্যাস ও নাটক পড়ি, তাহার অধিকাংশ প্রণয় ও অস্বাভাবিক ঘটনাপূর্ণ। তুমি একখানা উপন্যাস লিখ, যাহাতে বিশুদ্ধভাব, ধর্ম্মবিষয় এবং যাহাতে দেশের কুপ্রথা নিবারিত হয়, এমন কথা থাকিবে"। আমি তাহার কথামত হারাণী ওরফে চারুহাসিনী লিখিয়াছি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বগুড়া প্রভৃতি জিলাতে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। আমরা তখন বগুড়াতে ছিলাম। আমি কোঠার মধ্যে বসিয়া চারুহাসিনী লিখিতেছিলাম। কুসুম বারিন্দায় বসিয়া কোন একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। কুসুম হঠাৎ বারিন্দা হইতে লাফ দিয়া বলিল, “বাবা! ভূমিকম্প।” আমি ভাবিলাম, কুসুম কখনো ভূমিকম্প দেখে নাই, কেমন করিয়া বুঝিল যে ভূমিকম্প হইয়াছে? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় সমস্ত গৃহ কম্পিত হইল এবং দেওয়াল ফাটিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে টেবল ও পশ্চাতে চেয়ার; আমার বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইল। কুসুম আমাকে ডাকিল এবং হরি হরি বলিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া কুসুমকে এক হস্তে ও তাহার প্রসূতিকে অন্য হস্তে ধারণ করিলাম। কোন কোঠা ভাঙ্গিয়া কুসুমের গায়ে পড়িতে না পারে, কুসুম এমন স্থলে দণ্ডায়মান ছিল।

কোন সময়ে সুরেন্দ্রকে তাহার মাসীমাতা কি পদ্য পুস্তক পড়াই-তেছিল। তাহাতে “জীবন শুষ্ক” এইরূপ একটি পদ ছিল। সুরেন্দ্রের মাসীমাতা বুঝাইল, “প্রাণ শুখাইয়া গেল।” কুসুম নিকটে ছিল; সে বলিল “মা! এখানে জীবন অর্থ প্রাণ নহে, এখানে জীবন অর্থ জল।” কুসুমের প্রসূতি বলিল “জীবন অর্থ জল কোথায় পালি? তিনি বলেছেন কি?” কুসুম বলিল, “না, বাবা বলেন নাই, মহাভারতে পেয়েছি, ‘বরুণ অস্ত্র মারি পার্থ বরিষে জীবন।’ বরুণ অস্ত্র মারি কি প্রাণ বর্ষণ করিল? বরুণ অস্ত্র মারি জল বর্ষণ করিল।”

এই সময়ে কুসুমকে ইংরেজি পড়াইতে আরম্ভ করি। একদিন একখানা প্যারীচরণ সরকারের ফাষ্টবুক পড়াইতে আরম্ভ করিলাম।

এ, বি, সি ইত্যাদি একবারেই শিক্ষা করিল। তাহার পর বলিল, "কোন্ অক্ষরের কি উচ্চারণ বলিয়া দেও।" আমি বলিলাম এ, একার, বি ব্ ইত্যাদি। তখন সে বলিল, "তবে বি, এ, বে; সি, এ সে; ডি, এ ডে; আমি বলিলাম সির পর এ থাকিলে কে; জির পর এ থাকিলে গে হয়। এইরূপ সামান্য কিছু পড়াইলাম। ১০। ১২ দিবসের মধ্যে সেই পুস্তক শেষ করিল। তাহার পর এক দিবস কুসুম বলিল, "বাবা! ইংরেজি পড়ে লাভ কি? কে দৌড়িতে পারে, আমার লাটিম, ইহা পড়ে কি হবে? বাঙ্গালা পড়িলেই হবে। ইংরেজি প'ড়ে আমার বৃথা সময় যাবে।" কিন্তু তথাপি আমি কয়েক খানা ছোট ইংরেজি পুস্তক পড়াইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে তিনটি কবিতা তাহার ভাল বোধ হইয়াছিল, এবং সেই তিনটি কবিতা সে কণ্ঠস্থ করিয়াছিল।

I

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are,
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark,
Thanks you for your tiny spark;
He could not tell which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep
And often through my curtains peep;
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

2

Now I wake and see the light;
God has kept me through the night;
Make me good, O Lord, I pray;
Keep and guard me through this day.

O Lord, my God to thee I pray,
When from my bed I rise
That all I do and all I say
Be pleasing in thine eyes.

3

This night, when I lie down to sleep,
I give the Lord my soul to keep;
If I should die before I wake,
I pray the Lord my soul to take.

In my little bed I lie,
Heavenly Father, hear my cry:—
Lord, protect me through the night,
Bring me safe to morning light.

সন্ধ্যার সময় অনেক দিন ১নম্বর কবিতা মুখস্ত বলিত। রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় কোন দিন ৩নম্বর স্তব, কোন দিন বা নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিত।

জয় মা চণ্ডিকে, বিপদ খণ্ডিকে, শমনদণ্ডিকে তারিণি।
চণ্ডঘাতিকে, মুণ্ডপাতিকে, ভক্তমঙ্গলকারিণি॥
বরাভয়করা, খর খড়্গধারা শঙ্করহৃদি বাসিনি।
এদীন তনয়া ডাকে মা অভয়া দয়াকর ভয়নাশিনি॥

কোন দিবস প্রাতে ২নম্বর ইংরেজি স্তব পাঠ করিত, কোন দিবস যাহা মনে ভাল বোধ হইত, সেই রূপই ঈশ্বরের স্তব করিত।

আমি তাহার পুস্তক পাঠের স্পৃহার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারি নাই। আমার নিকট রামায়ণ, মহাভারত, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, সৌরপুরাণ প্রভৃতি যে সকল পুস্তক ছিল, এবং বগুড়া স্কুলের লাইব্রেরিতে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক ছিল, সমস্ত পাঠ করিয়া সে আমাকে নূতন পুস্তক ক্রয় করিতে অনুরোধ করিল। আমি আর পুস্তক ক্রয় করিতে পারিলাম না। তখন বগুড়ার প্রথম মুন্সেফ্ দুর্গাচরণ বাবুর বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। দুর্গাচরণ বাবুর দ্বিতীয় পরিণয়ের স্ত্রী, লেখা পড়া জানিত। তাহার নিকট হইতে নানাবিধ পুস্তক আনিয়া পাঠ করিত।

বটব্যাল সাহেব কুসুমকে ভাল বাসিতেন। অনেক সময় আমার বাসার নিকট আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, "কুসুমকে সঙ্গে আনুন।" শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রঠাকুরের রচিত পদ্যগ্রন্থ তিনি কুসুমকে অধ্যয়ন করিতে দিয়াছিলেন। তিনি কুসুমকে সংস্কৃত পাঠ করিতে বলেন। কুসুম সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছু পড়িয়াই আমাকে বলিল, "বাবা সংস্কৃত ও ইংরেজীর যে সকল পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদিত হয়েছে, তাই আমায় পড়্তে দেও।" তদবধি আর সংস্কৃত পাঠ করে নাই।

২রা শ্রাবণ কুসুমের অষ্টমবর্ষ অতীত হইল। আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজার সময় আমরা বাড়ী গেলাম। জলপথে বাড়ী গিয়াছিলাম। যমুনা ও পদ্মার সংযোগস্থলের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে নাবিকগণ সন্ধ্যার সময় নৌকা রাখিয়াছিল। সেই সময় কুসুম বলিল, "দেখ বাবা! নদীর জল কল্ কল্ ক'র্ছে, আর চাঁদের ও তারাগুলির ছায়া নদী-বক্ষে কেমন সুন্দর দেখায়!" নদী সে স্থানে অতি প্রশস্ত। ভোর বেলা সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড ও রক্তিমাকার দেখাইয়াছিল। কুসুম বলিল "বাবা! দেখ, শীঘ্র দেখ, ঊষার ললাটে কেমন সুন্দর সিন্দূরের ফোটা।"

দেশে অনেকেই কুসুমের কবিত্ব শক্তি পরীক্ষার্থ আসিয়াছিল। কাহার নিকট কি বলিয়াছে, আমি সব জানি না। কুসুম যখন তাহার মাতুলালয় রাড়ীখাল যায়, তাহার মাতুল কুমুদিনীকান্ত রায় (যিনি এখন হাওড়ার মুন্‌সেফ্) কুসুমকে ডাকিয়া তাহার প্রাসাদের মধ্য কুঠরিতে নিলেন এবং বলিলেন "কুসুম! আমি একপদ রচনা করি, তুমি আর এক পদ বল।" কুসুম কোন শব্দ প্রয়োগ করিল না।

কুমুদিনী বাবু বলিলেন—

"আকাশের গায় দেখ কি সুন্দর হায়।"

কুসুম বলিল—

"ছোট ছোট তারাগুলি ভেসে ভেসে যায়॥"

কুমুদিনী বাবু বলিলেন—

"হীরকের খণ্ড যেন করে ঝল মল।"

কুসুম বলিল—

"তার মাঝে শশধর করে টল মল ॥"

হাওড়ার হরিমোহন বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা নলিনী, কুমুদিনী বাবুর কেলীকুঞ্চিকা। তিনি তখন কুমুদিনী বাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কুমুদিনী বাবু কুসুমকে নলিনীর রূপ বর্ণনা করিতে বলেন; কুসুম তখন বর্ণনা করিল—

নলিনীর মুখরুচি, হেরি দুঃখ গেল ঘুচি,
ধরাগেল আকাশের চাঁদ।
পদ্ম-গন্ধে অলি উড়ে, কুন্দদন্তে রোধে তারে,
বিধাতার অপরূপ ফাঁদ ॥
কিবা সৌন্দর্য্যের শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
কেশ যেন বিষধর ফণী।
তার ভুজ-লতা হেরি, মৃণাল প্রবেশে বারি,
আঁখি হেরি পলায় হরিণী ॥

উপস্থিত সকলেই অতীব সন্তোষ লাভ করিল। নলিনী কবিতার এক খণ্ড নকল নিয়াছিল। আমি বলিলাম "দেখ কুমুদিনী বাবু! আট বৎসরের বালিকা কেবল যে পদ মিলাইয়াছে, এমন নহে, ইহার কবিতার কেমন মাধুরী! মুখখানা শুদ্ধ যে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে, এমন নহে; তাহার সঙ্গে একটুকু বিশেষ ভাব দিয়াছে। চন্দ্র অতি সুন্দর জিনিষ, কিন্তু অতি উচ্চ বলিয়া হাতে ধরা যায় না, এই দুঃখ লোকের মনে ছিল। কিন্তু অদ্য নলিনীর মুখরুচি দর্শনে সে দুঃখ দূর হইল। কারণ নলিনীর বদন-কমল অবিকল চন্দ্র। তাই চন্দ্র হাতে ধ'রে,

চাঁদ ধরা যায় না বলিয়া যে দুঃখ ছিল, তাহা দূর হইল। ইহাতে কত ভাব। মুখে পদ্ম-গন্ধ এবং দন্তগুলি কুন্দফুলের ন্যায়। সেই রূপকে বিধাতার কৌশলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছে। "তার ভুজ-লতা হেরি মৃণাল প্রবেশে বারি, আঁখি হেরি পলায় হরিণী" ঠিক যেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাবর্ণন। আমি কিন্তু কুসুমকে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে দেই নাই।

বিক্রমপুরস্থ কোলা নিবাসী ললিত কুমার বসুর দ্বিতীয়া কন্যা কিরণ্ময়ী কুসুমের মাসতাত ভগিনী। কিরণের অনুরোধ বশতঃ তাহার রূপ বর্ণনা—

কিরণের রূপহেরি হেন মনে লয়।
যাজ্ঞসেনী হল কিবা ভূতলে উদয়॥
কুরঙ্গিনী পায় লাজ নয়ন শোভায়।
কুন্তলের শোভা হেরি সাপিনী লুকায়॥

শারদীয়া পূজার পর আমরা বগুড়া গেলাম। কুসুমের ছোট পিসা গিরিশচন্দ্র রায় চাকুরির উদ্দেশে বগুড়া গিয়াছিল। এক দিবস কুসুম তাহার সঙ্গে করতয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। নদীর পার নবাব আবদস্ শোভান চৌধুরির বাড়ী। কুসুম তাঁহার বাগান দেখিল এবং তাহার পিসাকে কয়েক খানা ফুলের ডাল আনিতে অনুরোধ করিল। গিরিশ ফুলের ডাল আনিয়া কুসুমের শয়নের কোঠার পশ্চিম দিকে রোপণ করিল। কুসুম নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া আমার হস্তে দিল—

ওকি সখি! কি করিলে, কোন্ প্রাণে ছিঁড়ে নিলে,
গোলাপ কুসুম ছিল কানন আলিয়া।

কি সুন্দর ছিল শোভা, মুনি-জন-মনোলোভা,
কণ্টক আবৃত ডালে ছিল যে হেলিয়া ॥

কুসুম, সুরেন্দ্র এবং আমি স্বহস্তে সেই ফুলগাছে জল দিতাম। ক্রমে যখন গাছগুলি হইতে অঙ্কুর বাহির হইল তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

কুসুমের প্রসূতি প্রায়ই বলিত, কন্যা সন্তান কেবল লেখাপড়া শিখ্‌লে চল্‌বে কেন? গৃহ-কর্ম্ম শিক্ষা করা চাই, উলের কাজ শিখ্‌তে হয়, চিত্র শিখ্‌তে হয়। কুসুমের মামাত ভ্রাতা বিপিনবিহারী রায় অধ্যয়ন জন্য বগুড়া গিয়াছিল। সে স্কুল হইতে আসিয়া গরম ভাত খাইত। কুসুম এক দিবস বলিল "বাবা! আমাকে ছোট কড়া, হাতা আর বেড়ী কিনে দাও, আমি খেলা ঘরে ভাত পাক কর্ব্ব এবং বড় দাদাকে খেতে দেব।" আমি তাহাকে ছোট কড়া ইত্যাদি কিনিয়া দিলাম। সে অতি উৎসাহের সহিত ভাত পাক করিয়া আমাকে বলিল "বাবা! এই ত ভাত পাক করা?"

বগুড়া থাকা সময়েই কুসুমের প্রথম বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। তাহার ছোট মাতুল কুমুদিনী বাবু হাওড়ার হরিমোহন বাবুর প্রথম কন্যা বিবাহ করেন। ঈশান বাবু হরিমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা। ঈশানবাবু তখন কলিকাতা এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনেরেল। তিনি কুমুদিনী বাবুর নিকট তাঁহার প্রথম পুত্রের সহিত কুসুমের সম্বন্ধের প্রস্তাব করেন। কুসুমের বয়স তখন মাত্র অষ্টম বর্ষ অতীত হইয়াছিল। তাই তখন তাহার বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা হইল না।

বগুড়ার একজন উকিল বাবু রজনীকান্ত মজুমদারের, তাহার ছোট পুত্রের, কুসুমের ও আমার আহারের বন্দোবস্ত এক দিন আমাদের স্কুল-

গৃহে করিয়াছিলাম। কুসুম আমাকে বলিল "বাবা! রজনী বাবুর নিকট হইতে এই খরচের অংশ নিওনা"। আমি একথা রজনী বাবুকে বলাতে রজনীবাবু বলিলেন, "কুসুমের অন্তঃকরণ অতি মহৎ।"

আমার একটি খুল্লতাত ভ্রাতা রেবতীমোহন ঘোষকে আমি বগুড়া পুলিশকোর্টে কাজ দেওয়াইয়াছিলাম। কুসুমের নিকট সে তাহার মনের কথা অনেক সময় বলিত। একদিবস কোর্ট সব্ইন্স্পেক্টর রেবতীকে অন্যায় কথা বলিয়াছিল। কুসুম রেবতীর নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া আমাকে বলিল, "বাবা! পুলিশ সাহেবের নিকট যাইয়া রেবতী কাকার এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে হইবে।" আমি তাহার অনুরোধে সেই দিবসই পুলিশ সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। পুলিশ সাহেব ও তাহার প্রতিবিধান সেই দিবসেই করিলেন। কুসুম শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল।

বৈশাখ মাসে কুসুমের ৮ আট বৎসর ১০ দশ মাস বয়স হইল। সেই মাসেই আমি পাবনা বদ্‌লি হইলাম। কুসুমের মাতুলভগ্নী প্রফুল্লের বিবাহ উপলক্ষে কুসুম ও তাহার প্রসূতিকে রাড়ীখাল রাখিয়া আমি পাবনা গেলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বিপিন, কুসুম, তাহার প্রসূতি ও সুরেন্দ্র পাবনা গেল। পাবনার সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা আমার বাসার অতি সন্নিহিত ছিল। ক্রমে আমাদের আলাপ হইল। হরগোবিন্দ বাবুর আহার, নিদ্রা ও কাচারির সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময় আমাদের বাসায় অতিবাহিত হইত। তিনি কুসুমের সহিত আলাপ করিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিতেন। তাঁহার বাসায় একটী নারিকেল কুলের গাছ ছিল। তিনি সকাল বেলা গছতলায় যে সকল পাকা কুল

পতিত থাকিত, তাহা কুড়াইয়া নিয়া আমার বাসায় আসিতেন এবং বলিতেন, "কুসুম ফুল নেও"। কুসুমকে তিনি সময় সময় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উত্তর শ্রবণে আহ্লাদে গদ গদ হইতেন। তাঁহার বাসায় যখন কোন ভাল তরকারী পাক হইত, তিনি তাহা কুসুমের জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

কুসুম আমার সঙ্গে কখন কখন স্কুলের ও জজ আদালতের ফুল-বাগান দেখিতে যাইত। এক দিবস জজ আদালতের বাগান দেখিয়া বাসায় আসিয়া লিখিল—

দেখ বোন চেয়ে দেখ বাগানের পানে।
কত রকমের ফুল ফুটেছে সেখানে॥
ইহাদের মাঝে আমি ভাল বাসি তায়।
সৌরভ বিতরে আর সুন্দর দেখায়॥
এসব বিভুর কৃপা জানিও নিশ্চয়।
তাঁহারই সৃষ্ট এই কুসুম নিচয়॥

পাবনার অনেক জমিদার কুসুমের কবিতা শ্রবণ মানসে আমার বাসায় আসিতেন। বাবু রসিকলাল মজুমদার তাহার মাতা ও মাতা-মহীকে দেখাইবার জন্য এক দিবস কুসুম ও আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট জজসাহেবের জায়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কুসুমকে অতি স্নেহ করিতেন এবং বলিতেন, এই বয়সে কুসুমের এরূপ কবিতা বিস্ময়কর। কুসুম এক দিবস তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। তাঁহার একটি অল্পবয়স্কা কন্যা কুসুমকে এতই ভালবাসিত যে, কিছুতেই সে কুসুমকে বাসায় ফিরিয়া আসিতে দিতে চাহে নাই। কুসুম বাসায় আসিবার সময় সে এমন চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে

আরম্ভ করিল যে,জজ সাহেব তাহাকে আপন ক্রোড়ে রাখিয়াও সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না।

শ্রাবণ মাসে এক রজনীতে কুসুম আমার নিকট শয়ন করিয়াছে, এমন সময় অবিরল ধারায় বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল এবং ভেককুল ডাকিতে আরম্ভ করিল। কুসুম বলিল "বাবা—

চলিলেম গ্রীষ্মঋতু বরষা আইল।
ভেকের আনন্দ তাহে বাড়িতে লাগিল॥
অবিরত পড়ে জল নাহিক বিশ্রাম।
গ্যাং গ্যাং শব্দ ভেক করে অবিরাম॥
মেঘের গর্জ্জন শুনি শিখী নৃত্য করে।
বারিবিন্দু ধরণীকে সুশীতল করে॥

এই ভাবে কুসুমের নবম বর্ষ অতীত হইল। পাবনা ইংরেজি স্কুলের লাইব্রেরীতে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক ছিল, কুসুম সে সকলই অধ্যয়ন করিল। এক দিবস আমাকে কুসুম জিজ্ঞাসা করিল; "বাবা! অষ্ঠিবান শব্দের অর্থ কি?" আমি বলিলাম, "কোন্ স্থলে? সে স্থানটি পড়।" সে বঙ্গবিজেতা হইতে তাহা পড়িল। তাহাতে যেন এমন ভাব ছিল, রাজার শরীর-রক্ষক অষ্ঠিবতে নির্ভর করিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আমি বলিলাম বোধ হয় অষ্ঠিবান অর্থ তরবারি। তরবারির উপর নির্ভর করিয়া শরীর রক্ষক রাজার নিকট দণ্ডায়মান হইল"। কুসুম বলিল তাই কি ভাল হয়? আমার বোধ হয় অষ্ঠিবান শব্দের অর্থ জানু। শরীর রক্ষক জানুর উপর দণ্ডায়মান হইল। তাহার অর্থই আমার ভাল বোধ হইল। আমি

স্কুলে যাইয়াই একখানা বাঙ্গালা অভিধান বাহির করিলাম। তাহাতে দেখিতে পাইলাম,অষ্ঠিবান্ শব্দের অর্থ জানু। আমার অপরিসীম আনন্দ বোধ হইল। আমি ভাবিলাম, আমি ইহাকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠাই নাই, আর কেহ ইহাকে লেখাপড়া সম্বন্ধে উপদেশ দেয় নাই, আমি ইহাকে কোন দিন হাতে ধরিয়া লেখাই নাই, কখনও কোন বাঙ্গালা শব্দের অর্থ বলিয়া দেই নাই, কেমন করিয়া এ বালিকা লেখা পড়া শিক্ষা করিল ? কেমন করিয়া ইহার শব্দের অর্থ বোধ হয় ? নিশ্চয় এ জ্ঞান পূর্ব্বজন্মার্জিত। ঈশ্বরের আদেশে আগমন করিয়াছে। ইহার দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে আরম্ভ করিল।

আমার গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, কুসুমকে বিবাহ দিয়া জামাই ঘরে রাখিব। একটি মাত্র কন্যা ; ইহাকে অন্য গৃহে বিবাহ দিলে আমাদের গৃহ শূন্য বোধ হইবে। তাহার পর হরগোবিন্দ বাবুর সহিত পরামর্শ করিলাম। তিনি বলিলেন "এমন কাজ কখনও করিবেন না, ঘরজামাই রাখিবেন না। ঘরজামাই রাখিলে আপনার বাড়ীর সকলের হিংসা হইবে এবং বর ভাল হইবে না। যদি আপনি হঠাৎ মরিয়া যান তাহাহইলে কুসুমের উপায় কি হইবে ? আপনার নিজের সুখের জন্য স্বার্থপর হইয়া কুসুমের জীবন দুঃখময় করিবেন না। ঘরজামাই রাখিলে কুসুম শ্বশুর বাড়ীর সুখ, শ্বশুর ও শ্বাশুরীর আদর ভোগ করিতে পারিবে না। আপনার একটী মাত্র কন্যা, সুগঠনা, বুদ্ধিমতী, দেখিলেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়, অতি নম্রস্বভাব, স্বভাবে ও শরীরে যেন লাবণ্য মাখা, কথা অতি মধুর, লেখা পড়া বেশ জানে। অনেক অবস্থাপন্ন লোক আপনার কন্যার জন্য লালায়িত হইবে। ভাল একটি বর দেখিয়া কন্যা বিবাহ দেন। সর্ব্বদা সন্দেশ

খেতে ভাল লাগে না, পরিবর্ত্তন চাই। আপনার গৃহে কুসুম এক প্রকার সুখ ভোগ করিবে, আবার শ্বশুর গৃহে অন্যপ্রকার সুখ ভোগ করিবে। অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সম্বন্ধ করুন, আপনার সম্পত্তিও পাইবে, শ্বশুরের সম্পত্তিও পাইবে, কুসুমের সম্পত্তি দ্বিগুণ হইবে।” তাঁহার পরামর্শই শিরোধার্য্য করিলাম। কুসুমের বিবাহ অবস্থাপন্ন, বিদ্বান্, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বরের সহিত দিব স্থির করিলাম।

আমার পরিবারকে আমি বলিলাম, “কুসুমের বিবাহ ষোল বৎসরের পূর্ব্বে দিব না।” আমার পরিবার কিছুতেই সম্মত হইল না।

পূজার সময় বাড়ী গেলাম। কুসুম তাহার সমবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু তাহারা যখন কলহ করিত, কুসুম তাহাদিগ হইতে অন্তরে থাকিত। নানা স্থান হইতে কুসুমের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। আমি কাহারো সহিত তখন সম্বন্ধ সুস্থির করিলাম না। সে বৎসর বিবাহ দিব না, স্থির করিয়া কুসুম সহ পূজার পর পাবনা গেলাম। যে সকল স্থলে সম্বন্ধ উপস্থিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। কুসুমের জন্য বর আমার অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। অনেক স্থল হইতেই তাহার সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাবনার সিবিলসার্জন ছিলেন। তিনি অতি সচ্চরিত্র লোক, আমার বাসায় অনেক সময় যাইতেন। এক দিবস কুসুমের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। তিনি দেখিয়াই বলিলেন, মেয়েটি যেন পূর্ণলক্ষ্মী। তিনি তাঁহার বাসায় অনেক সময় পালকি করিয়া কুসুমকে নিয়া যাইতেন। তাঁহার স্ত্রী কুসুমকে খুব ভাল বাসিতেন এবং তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি কুসুমকে সুন্দর একটি চায়না পুতুল দিয়াছিলেন। সে পুতুলটি এখনও আমার গৃহে আছে।

বৈশাখ মাসে কুসুমের দশবৎসর দশ মাস বয়স হইল। তাহার প্রসূতি বিবাহের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। ঢাকা জিলার আবিধারা গ্রামস্থ পূর্ণচন্দ্র রায় দুর্গাপূজার সময় তাঁহার একটি জ্ঞাতি স্ত্রীলোককে সম্বন্ধ প্রস্তাব জন্য আমাদের গ্রামে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের জ্ঞাতি সম্পর্কে পিসী। তিনি পূজার পর কয়েকখানা চিঠি আমার নিকট লিখিয়াছিলেন। আমি উত্তর করিয়াছিলাম, 'আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধে যাইয়া পাত্র দেখিব এবং পাত্র পছন্দ হইলে কথাবার্ত্তা সুস্থির করিব। জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধে আমি আমার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাসমোহন ও একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সতীন্দ্রমোহন এবং ভৃত্য সহ আবিধারা যাত্রা করিলাম। রাসমোহন ও সতীন্দ্র জাহাজ হইতে নামিয়া সেই দিবসই আবিধারা গেল। কিন্তু পালকি অভাবে আমি সেই দিবস আবিধারা যাইতে পারিলাম না। আমি আমার ভৃত্য সহ রাজথাড়া মুন্সীবাড়ীতে সে রজনী যাপন করিলাম। সেই বাড়ীতে পূর্ণরায়ের একটি জ্ঞাতি বসন্তরায় ছিলেন। তিনি আমার বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিলেন। আমি তাঁহার নিকট পূর্ণরায়ের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেশচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলাম। তৎপরদিবস আবিধারা গেলাম। যোগেশকে ও তাহার বাড়ী দেখিয়া আমার সম্বন্ধে অভিলায হইল। যোগেশের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পূর্ণবাবুর সরল স্বভাব এবং স্নেহপ্রবণতা দর্শনে আমার বিশেষ প্রীতি হইল।

তাহার পর পূর্ণবাবু কুসুমকে দেখিতে কামারগাঁ আসিলেন। বিবাহের কথাবার্ত্তা সুস্থির হইল। কুসুম আমার একমাত্র কন্যা এইজন্য যোগেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমিই নিয়াছিলাম। পূর্ণবাবু কুসুমের হাতের লেখা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কুসুম বাঙ্গালা কি লিখিয়াছিল স্মরণ নাই ; কিন্তু ইংরেজিতে লিখিয়াছিল—

This night when I lie down to sleep
I give the Lord my soul to keep;
If I should die before I wake,
I pray the Lord my soul to take.

& & &

কুসুম লালনীল পেন্‌সিল্ দ্বারা একটি লতা আঁকিয়াছিল। হাতের লেখার সহিত তাহা আমি পূর্ণবাবুর নিকট ডাকে পাঠাইয়াছিলাম।

হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ী বাঙ্কুড়া; কার্য্যোপলক্ষে পাবনা ছিলেন। তিনি কুসুমকে এতই স্নেহ করিতেন যে, তাহার বিবাহে ব্যয় করিবার জন্য আমাকে পাঁচশত টাকা হাওলাত দিয়াছিলেন এবং ভাগ্যকুলের হরেন্দ্র বাবুও তাহার বিবাহে একহাজার টাকা হাওলাত দিয়াছিলেন।

১৩০৬ সনের ২০ আষাঢ় দশ বৎসর এগার মাস ঊনিশ দিবস বয়সে কুসুমের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। কুসুমের সন্তোষার্থে আমি তাহাকে সাধ্যাতীত ভূষণে ভূষিত, নানাবিধ বাদ্য ও বাজির আয়োজন এবং প্রায় সমস্ত আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

অতি আমোদে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল। পূর্ণবাবু বিবাহের পর আমাকে লিখিলেন "কুসুম আপনার যেমন আদরের ধন, আমাদেরও সেইরূপ।" কুসুম তাহার শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী, দিদি শাশুড়ী, ননদ ও দেবর প্রভৃতি তাহাকে কত আদর ও স্নেহ করিয়াছে, তাহা আনন্দগদগদস্বরে আমার নিকট বর্ণনা করিল। কুসুম বলিল "এক দিবস আমার শাশুড়ীর অসুখ হইয়াছিল। আমি তাঁহার মাথা টিপিতে ছিলাম। এমন সময় একটি চাকর আসিয়া বলিল "বৌমা! পান।" আমার শাশুড়ী বলিলেন "বৌটার আর নিস্তার নাই, একটুকু বৈসে মাথা টিপ্‌ছে, এরি মধ্যে আবার পান।" কুসুম

আরও বলিল, আমার দেবর যতু আমাকে আমার বধূঠাকুরাণী বলিয়া ডাকে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার কন্যা যোগ্য পাত্রে ও ঘরে দান করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

শ্রাবণ মাসে কুসুম বাসার সকলের সহিত পাবনাতে গেল। এক দিবস আমি বারিন্দায় বেত্রাসনে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় গৃহ মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া কুসুম বলিল "বাবা! আমরা ঈশ্বরের সহিত ওতপ্রোত ভাবে আছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কেমন?"

কুসুম বলিল—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদবন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

বিষ্ণু যখন আমাদের অন্তরে ও বাহিরে আছেন, তখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে, আমরাও ঈশ্বরের মধ্যে। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে মাখা যোখা হয়ে আছি।" আমি মনে মনে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম, এইমাত্র এগার বৎসর বয়স; এ বালিকা ঈশ্বর বিষয়ে এত গভীর ভাব কেমন করিয়া উদ্ধার করিল। আমার নিকটই কুসুম এ শ্লোক শুনিয়াছিল; কিন্তু আমি এমন ভাবে ঈশ্বরকে কখনও চিন্তা করি নাই।

পূজার পূর্ব্বে হরগোবিন্দ বাবু একদিবস সন্ধ্যার পর আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "কুসুম! তুমি উপস্থিত বর্ণনা করিতে পার, এই শারদীয়া নিশির বর্ণনা কর।"

কুসুম বলিল—

হাসে শশধর সুনীল গগনে।
হাসিছে তারকা প্রফুল্ল আননে॥
হাসে তরঙ্গিনী সুধাংশু-কিরণে।
হাসে চকোরিণী শশীদরশনে॥
হাসে কুমুদিনী বিমল কিরণে।
বহে সমীরণ মধুর স্বননে॥
প্রফুল্ল কুসুম হাসিছে কাননে।
প্রকৃতি হাসিছে বিভুগুণগানে॥

আমাদের বাসার দক্ষিণদেশে একটি সুন্দর সরোবর ছিল, আমাদের বাসার বারিন্দায় বসিলে বেশ দৃশ্যমান হইত। সেই সরোবরে মরালগণ সদাই ক্রীড়া করিত। কুসুম মরাল ক্রীড়াদর্শনের জন্য একযোড়া মরাল ক্রয় করিয়াছিল। এক দিবস কুসুম আমার নিকট একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল বাবা—

কিসুন্দর সরোবর শোভিছে অদূরে।
মরাল যুগল তাহে সুখে ক্রীড়া করে॥
প্রফুল্ল কমলে অলি করয়ে গুঞ্জন।
মধুলোভে ধায় তথা মধুকরগণ॥

ফরিদপুর জিলার ছবজজ আদালতের সেরেস্তাদার তারাকুমার রায়ের সহিত আমি অনেক কাল এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছি। তাহার সহিত আমার গাঢ় প্রণয়। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে পাবনা

গিয়াছিলেন। তিনি ফটিকবাবু ডিপুটি মেজিষ্ট্রেটের বাসায় ছিলেন। আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ে দেখ্‌ব।" আমি কুসুমকে ডাকিলাম। কুসুম অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল। তারাকুমার বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মেয়ে পাদপূরণ করিতে পারে। আমি একটি পদ বলি, কুসুম আর এক পদ বল।" কুসুম কোন উত্তর না করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল। ফটিক বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি জায়াশোকে কাতর ছিলেন। তারাকুমার বাবু বলিলেন—

"আহা মরি জায়াশোক কেমন কঠিন।

কুসুম বলিল—

"দিন দিন হয়ে যায় কলেবর ক্ষীণ॥

কুসুম এই ভাবে সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। আমার বাসায় অনেক আমগাছ ছিল। ফাল্গুন মাসে আমের মুকুল বাহির হইয়াছে, কোকিল ডালে বসিয়া মুকুল খাইতেছে এবং সময় সময় ডাকিতেছে। কুসুম আমার নিকট বসিয়া লিখিল—

ঋতুরাজ বসন্তের হইল উদয়।
কুহুস্বরে পিকগণ প্রাণ হরে লয়॥
তরুরাজি সুশোভিত পল্লব নধরে।
মধুলোভে ফুলে ফুলে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
চূত মুকুল কুল পরিমল বিতরি।
অলিবৃন্দ মনপ্রাণ লইতেছে হরি॥

মালতী মল্লিকা জাতী হ'ল বিকশিত।
মধুর সুবাসে হ'ল জগত পূরিত ॥

ফাল্গুন মাসেই কুসুম আবিধারা গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে যোগেশ ও কুসুমকে পাবনা নিয়া গেলাম। আবিধারা হইতে পাবনা যাত্রাকালীন পূর্ণবাবু কুসুমকে বলিলেন "মা! ছেলে বলে যেন মনে থাকে।" কুসুম এ কথাটি তাহার প্রসূতিকে অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিল। যোগেশ ছয় সাত দিবস পাবনাতে থাকিয়া আবিধারা গেল। কুসুম পাবনায় রহিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে আমি হাজারিবাগ বদলি হইলাম। ১২ই জুলাই কুসুম, তাহার প্রসূতি, খুল্লতাত ভ্রাতা ভূপতি-মোহন ও মাসতাত ভ্রাতা সুরেন্দ্র সহ আমি হাজারিবাগ রওয়ানা হইলাম। ১৩ই জুলাই প্রত্যুষে আমরা গিরিডি উপস্থিত হইলাম। এখানে কুসুমের হৃদয়ে নবভাবের উদয় হইল। উচ্চ গিরিশ্রেণী দর্শনে তাহার অতিশয় প্রীতি হইল। কুসুম বলিল "বাবা! আমরা এখানে একদিন থাক্‌ব।" তাহার কৌতূহল নিবারণ জন্য আমি তথায় একদিবস বাস করিলাম। ১৪ই জুলাই বেলা নয়টার সময় আমরা হাজারিবাগ যাত্রা করিলাম। এক পুষপুষে ভূপতি ও আমি ছিলাম; আর এক পুষপুষে কুসুম, তাহার প্রসূতি ও সুরেন্দ্র ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তার কিছু অসুবিধা হইল। বরাকৈর নদী পার হইবার সময় কুসুম বলিল "বাবা! নদীর জল প্রচণ্ড বেগে পাথরের উপর পতিত হওয়াতে কেমন সুন্দর দেখায়।" কিছু দূর যাওয়ার পর একটি অতি উচ্চ গিরি দৃশ্যমান হইল। কুসুম আমাকে ডাকিয়া বলিল "দেখেছ বাবা! ঐ পাহারটি কেমন উচ্চ। উহার শিখর দেশ মেঘ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। শিখরদেশে সূর্য্যের কিরণ পড়ে কেমন সুন্দর

দেখাচ্ছে, তাহার নীচে মেঘ।” এইরূপে প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে ১৫ই জুলাই রাত্রিতে হাজারিবাগ উপস্থিত হইলাম।

হাজারিবাগ স্কুলের হাতার মধ্যেই হেড্‌মাষ্টারের বাসের জন্য অতি সুন্দর এবং বড় একটি বাঙ্গালা আছে। বাঙ্গালার সম্মুখেও দুই পার্শ্বে ফুলবাগান। নানাবিধ কুসুম ও সুন্দর বাসগৃহ দর্শনে কুসুম আনন্দে পরিপ্লুত হইল। স্কুলের মালীগণ নানাবিধ শাক সবুজি ও পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করিত। কুসুম তাহা দেখিয়া প্রফুল্ল হইত। হাজারিবাগ সহরটি তাহার অতি সন্তোষ জনক হইয়াছিল। এখানে অনেক বাড়ীতে ফুলের বাগান। রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কার ও সুন্দর। অনেক সাহেব এখানে পেন্‌সন্ নিয়া বাস করিতেছেন। তাহাদের বাসগৃহ ও কুসুমোদ্যান অতি মনোহর। সহরের নিকটে চতুর্দ্দিকে গিরিশ্রেণী এবং স্কুলের সন্নিধানে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদটি তিন ভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্র নদীগর্ভে বান্ধ দ্বারা বারিসঞ্চিত হইয়াছে। প্রথমটির জল সর্ব্বোচ্চ। সেইটি জলে পরিপূর্ণ হইলে একটি পাকা জলনালী দ্বারা দ্বিতীয়টাতে জল প্রবেশ করে, এবং দ্বিতীয়টি জলে পরিপূর্ণ হইলে আর দুইটি জলনালী দ্বারা তৃতীয়টিতে জল প্রবেশ করে। দেখিলে বোধ হয় যেন জলের তিনটি ধাপ। দ্বিতীয়টি অন্য দুইটি অপেক্ষা বড় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পাকা পরিষ্কার পথ। পথের দুই ধারে নানাবিধ ফুলের বেড়া। কুসুম এই হ্রদের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে বড়ই ভাল বাসিত। আমাকে এক দিবস বলিল, “বাবা! এ নগরটি বড়ই সুন্দর, রাস্তাগুলি প্রায়ই সরল এবং পরিষ্কার, রাস্তার দুইধারে কেমন সুন্দর বড় বড় গাছ, একধারের গাছগুলি ফুলের; ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, গাছের উপরেরদিকে কেমন

সুন্দর ঝাড়ের মত ফুল ফুটেছে, গাছগুলি যেন ফুলের মুকুট মাথায় পরেছে, প্রত্যেক বৃক্ষের পাদদেশে বিবিধ বর্ণের ছোট ছোট ফুলের গাছ কেমন সুন্দর দেখায়!"

আমি আষাঢ় মাসের শেষভাগে হাজারিবাগ আসিয়াছিলাম। ভাদ্র মাসে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক হয়। তাঁহার বিনোদিনী নাম্নী একটি কন্যা আছে। বিনোদিনীর এক বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার পিতাই তাহাকে অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন। পিতার আদরে বিনোদিনী তাহার মাতার কথা ভুলিয়াছিল। ভাদ্র মাসে বিনোদিনীর বিবাহ হইবে, বড় দাদা আমাকে লিখেন এবং আমার মত নিয়া দশমবর্ষ বয়সে তাহার বিবাহ দেন। বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, জানিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত আছি, এমন সময় আমাদের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক অঘোর বাবু বড় দাদার জ্যেষ্ঠপুত্র জলদার একখানা পত্র দেখাইলেন। তাহাতে লিখিতছিল, "বিনোদিনীর বিবাহের দশম দিবসে তাহার পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর দিবস বড় দাদা প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দৈনিক পূজা সমাপন করিলেন এবং নদীর পাড়ে বেড়াইলেন। তৎপর কালীবাড়ী দর্শন করিয়া বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "আমাকে অস্থির করে, আমার মাথায় ঔষধ তৈল দেও।" এই কথা বলিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল।"

২রা শ্রাবণ কুসুমের বার বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছিল এবং ভাদ্র মাসে বড় দাদার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। কুসুম এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া লিখিল।—

(৬)

"অকস্মাৎ একি হায়,
শত বজ্রাঘাত সম।
কাহার মৃত্যুর কথা,
শ্রবণে পশিল মম ?
চলিগেলে জ্যেষ্ঠতাত !
ছাড়িয়া সবারে তুমি।
তব দরশন পিতঃ,
আর কি পাবনা আমি ?
একটু কাঁদিলে যারে,
কোলেতে তুলিয়া লও।
মাতৃহীনা বিনোদিনী,
তাহারে ছাড়িয়া যাও ?
বাবা বিনা সে বালিকা,
কিছু নাহি জানে আর।
তোমারি যতনে সে যে,
ভুলেছিল কথা মা'র ॥
এত আদরের মেয়ে,
তাহারে ফেলিয়া যাও ?
কেঁদে কেঁদে সারা সে যে,
তার পানে ফিরে চাও ॥

ভাসাইয়া শোকার্ণবে,
আপন স্বজন গণে।
অকালেতে তুমি হায়,
চলিলে স্বরগ ধামে॥
মঙ্গল-আলয় তুমি,
করুণা-সাগর বিভু।
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা,
হউক সফল প্রভু॥
আমি কে যে জগতের,
মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি।
তোমার জগত তুমি,
যাহা ইচ্ছা কর হরি॥

আমি এই কাগজখানা পড়িয়া একবারে স্তম্ভিত হইলাম। এই বার বৎসরের বালিকা এমন প্রিয় জ্যেঠার বিয়োগে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিল! ক্রন্দন ও অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া আমাকে প্রবোধ দিল যে, মৃত্যু আমাদের মঙ্গলের জন্য। "তোমার জগত তুমি যাহা ইচ্ছা কর হরি" ঈশ্বরে এরূপ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বে আমি করিতে পারি নাই এবং এমন কথাও আমি পূর্ব্বে কাহারও মুখে শুনি নাই, It is entire resignation to the will of God.

আমার বাসার পূর্ব্বদিকে গিরীন্দ্রনাথ বসুর বাসা ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীর পুলিষ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনি প্রাচীন এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার বাসার পশ্চিমদিকে ও আমার বাসার পূর্ব্বদিকে

পুষ্পোদ্যান, মধ্যে হ্রদে যাইবার পথ। হ্রদের দক্ষিণ পাড়েই আমার বাসগৃহ। গিরীন্দ্র বাবুর বাসায় প্রতি সপ্তাহে উপাসনা এবং বাজনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। গিরীন্দ্র বাবুর স্ত্রী আমার স্ত্রীকে দিদি ও কুসুম তাঁহাকে মাসী মা বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি কুসুমকে বড়ই স্নেহ করিতেন। অনেক দিন তিনি কুসুম ও তাহার প্রসূতিকে আপন বাসায় নিয়া যাইতেন। তথাতে রিফর্মেটরি স্কুলের ষ্টোরকিপার কালীচরণ বাবু, বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী চঞ্চলা ও তাহার স্বামী ব্রজবাবু, জিলাস্কুলের চতুর্থ শিক্ষক সতীশ বাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং সময় সময় আমি, সমবেত হইতাম। চঞ্চলা এবং সুমতি কুসুমকে স্নেহ করিতেন। কুসুমের স্বভাবে কেমন এক প্রকার লাবণ্য ছিল, যাহার সহিত তাহার আলাপ হইত, সেই তাহাকে ভাল বাসিত। পরকে কেমন করিয়া আপন করিতে হয়, তাহা কুসুম বেশ জানিত।

কালী বাবু আমাকে বলিয়াছেন, "এক দিবস আমি এই গানটি করিলাম—

চিদাকাশে প্রেমচন্দ্র আনন্দ সুন্দর (তুমি); ভকত বাঞ্ছিত, তোমার মধুর প্রেম-সুধাতরে তৃষিত অন্তর। বিষয় কোলাহলে, পাপহলাহলে, ত্রিতাপ অনলে, মনপ্রাণ জ্বলে; আজ বিতরি করুণা, নিবার যাতনা, আশাপথ চেয়ে আছি নিরন্তর। হৃদয়ে জাগিছ হৃদয়ের স্বামী, অন্তরাত্মা হরি, অন্তরযামি, মোহে অন্ধ আমি, (তাই দেখিনা দেখিনা) পাপ-পথগামী, অধম পামর; চিদানন্দ ঘন, মূরতি মোহন, অপরূপ তব চিত্ত-বিনোদন, আজ দিয়ে দরশন, ও প্রাণ রমণ, আমার চিরদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

আমি উপাসনার পর চলিয়া গেলাম। কুসুম আমার যাওয়ার পর গিরীন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে বলিল, "কালী বাবুর এই গানটি বড়ই হৃদয়-

গ্রাহী। এই গানটি আমায় লিখাইয়া দিবেন ? গিরীন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুমি কি এসব গানের অর্থ বুঝিতে পার ?" কুসুম কোন উত্তর করিল না।

গিরীন্দ্র বাবু বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি" হৃদয়ে জাগিছ হৃদয়ের স্বামী, ইহার অর্থ কি ? কুসুম অতি মৃদুস্বরে বলিল, **"ঈশ্বর"**। গিরীন্দ্র বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ দিয়ে দরশন ও প্রাণ রমণ, চিরদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর" ইহার অর্থ কি ? কুসুম বলিল, "আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে পুনরায় দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।"

এক দিবস কুসুম বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী চঞ্চলা ও ইন্দুমতী প্রভৃতির সহিত শরৎকালে সন্ধ্যার সময় হ্রদের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া আসিয়া লিখিল—

দিবা অবসানে,
সন্ধ্যা আগমনে,
মরি শোভা, কিবা মনোহর !
ফুটিয়া উঠিছে,
একে একে সব,
ছোট ছোট ঐ তারকা নিকর ॥

কত মত ফুল
ফুটেছে আ মরি !

~~চাঁদের আলোতে,~~

সুবাসে জগৎ পূরিছে।

বিমল কিরণে,

প্রকৃতি যেন হাসিছে॥

সরোবর মাঝে,

কুমুদিনী হাসে.

আকাশে চাঁদিমা ভাসিছে।

চাঁদেরে দেখিয়া,

আনন্দে ভাসিয়া,

চকোর কেমন খেলিছে॥

নদীর বিমল,

সলিল মাঝারে,

আকাশের ছায়া প'ড়েছে।

দেখে মনে হয়,

প্রকৃতি রূপসী,

তারাহার যেন পরেছে॥

এই পদ্যটি লিখিয়া কাগজ খানা আমার হাতে দিল। আমি ছন্দটি ভাল করিয়া পড়িতে পারিলাম না। কুসুম আমাকে পড়িয়া শুনাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আকাশের তারাকে তারাহার না বলিয়া আকাশের ছায়ার তারাকে তারাহার বলিলে কেন?"

কুসুম বলিল "হার নীচের দিকে ঝুলান থাকে, আকাশ উপরের দিকে গোল; কিন্তু তাহার ছায়া হারের মত নীচের দিকে ঝুলান।"

এক দিবস কুসুম বলিল "বাবা! এবার আবিধারা যাওয়ার সময় কল্‌কাতা দেখে যাব। আর শুন্‌তে পাই, চন্দ্রমাধব বাবু আমাদের আত্মীয়। তিনি হাই-কোর্টের জজ এবং আমাদের দেশের তিলক। তাঁহার আদর্শ চরিত্র; তাঁহাকে দেখ্‌তে আমার ইচ্ছা হয়। আর স্বর্ণ দিদি ও তাঁহার স্বামী আনন্দমোহন বসু এবং সৌদামিনী দিদির সঙ্গে দেখা কর্বো।

আমি চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট পত্র লিখিলাম। তিনি উত্তর দিলেন।

CALCUTTA.
3, ALBERT ROAD.
January 21st 1901.

MY DEAR SIR,

Thanks for your kind letter of the 3rd instant. I am glad to learn you have been transferred to such a healthy place as Hazaribagh though it is rather out of the way.

I shall be extremely glad to see you and your daughter when you come over.

আমরা যে দিবস বাড়ী রওনা হইয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব দিবস গিরীন্দ্র বাবুর স্ত্রী কুসুমকে আহার করাইয়াছিলেন। যাবার দিবস তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুসুম তাহার প্রসূতিকে বলিল, 'আমি গেলে তুমি কেবল কাঁদ্‌বে,

তখন আর খেতে পার্ব্বে না, আমি বাসায় থাক্‌তে থাক্‌তে তুমি খাও।' কালী বাবু আমাকে পরে বলিয়াছেন, কুসুম যে রাত্রিতে এখান হইতে যায়, সেই রাত্রিতে গিরীন্দ্র বাবুর স্ত্রী সমস্ত রজনী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে এক দিবস সকাল বেলা কুসুম, তাহার একটি অল্পবয়স্কা পরিচারিকা এবং আমি, চন্দ্রমাধব বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রমাধব বাবু অতি আদরের সহিত কুসুমকে গ্রহণ করিলেন। সেই দিবস ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাসায় অতিথি ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রমাধব বাবু উপরে যাইয়া কুসুমকে বলিলেন "কুসুম! তুমি রূপ বর্ণনা করিতে পার, এই দুইটির রূপ বর্ণনা কর।" কুসুম বলিল "হাজারিবাগ হইতে পুষপুষ, রেল এবং ঘোড়গাড়ী চেপে এই মাত্র এখানে এসেছি, এখনই কি রূপ বর্ণনা করা যায়?" তিনি নীচে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনার কন্যা আমাকে নিতান্ত অপ্রতিভ করেছে।" চন্দ্রমাধব বাবুর স্ত্রী ও কন্যা অতি যত্নের সহিত কুসুমের স্নান ও আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। সেই দিবস রাত্রিতে চন্দ্রমাধব বাবুর বাসায় অনেক বড় বড় লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁহার বাসার উপর তালায় ও নীচের তালায় অনেক স্ত্রীপুরুষের সমাগম হইয়াছিল। কুসুমের আহারের ও বিশ্রামের পর চন্দ্রমাধব বাবু কুসুমকে কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। কুসুম উত্তর করিল, "বাড়ীতে অনেক লোক চতুর্দ্দিকে গোলমাল করিতেছে; এমন সময় কবিতা রচনা করা যায় না।" আমি সেই দিবসই হরিচৈতন্য

বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। হরিচৈতন্য বাবু রেজিষ্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টের প্রথম ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনি তখন পেন্‌সন্ নিয়া কলিকাতায় বাস করিতে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনী তৎপর দিবস প্রত্যূষে তাহার পাচিকা সহ একখানা ঘোড়গাড়ী আমাদের নিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। আমরা সকলে তাহার বাসায় গেলাম। যাওয়ার সময় চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "কুসুম! তুমি মাত্র এক দিবস আমার বাসায় রহিলে; যাবার সময় দেখা করিয়া যাইও।"

সেই দিবস কুসুমকে কলিকাতা মিউজিয়ম দেখাইলাম। তৎপর দিবস সৌদামিনীর বাসাতে আহারাদি করিয়া বেলা ১১টার সময় চিড়িয়াখানায় গেলাম। সেখানে সমস্ত প্রাণী দর্শন করিয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমরা পুনরায় চন্দ্রমাধব বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। কুসুম তখন দুই জন কি তিন জনের রূপবর্ণনা করিল। চন্দ্রমাধব বাবু নিজ হাতে তাহা লিখিয়া আমাকে দেখাইলেন এবং অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমরা যখন আহারাদি করিলাম, চন্দ্রমাধব বাবু আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং নানাবিধ সুখাদ্য আহারীয় দ্রব্য আরও খাওয়ার জন্য যত্ন করিলেন। সন্ধ্যার সময় কুসুমকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "কুসুম! কলিকাতা আসিলে, অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিও।" কুসুম বলিল "আমি আপনার জীবনচরিত লিখিব, আপনার জন্মতারিখ ও স্থান আমাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিন।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া কুসুমের হস্তে দিলেন।

আমরা সিয়ালদহে পৌঁছিলাম। কুসুম বলিল, "দেখ বাবা, চন্দ্রমাধব বাবু এত বড়লোক, তবু তাঁহার কেমন

অমায়িক স্বভাব। আমাদের কত যত্ন ক'রলেন। ইঁহার স্ত্রী ও কন্যা আমাকে এত আদর, যত্ন ও স্নেহ করেছেন যে, আমার আপন মামী ও মামাত ভগ্নীও কখন এত যত্ন করেন নাই। যত্ন ও স্নেহ করাই যেন ইঁহাদের স্বভাব। আমি ইঁহাদের স্নেহ ও যত্ন কখনও ভুলিতে পারিব না। আক্ষেপ রহিল, স্বর্ণ দিদির সঙ্গে দেখা করিতে পারিলাম না, আর আনন্দমোহন বাবুকেও চিনিতে পারিলাম না।" আমি বলিলাম, "এবার আমার বিদায় মাত্র আট দিন, তাহাদিগকে দেখাইতে সময় পাইলাম না। আর একবার আসিলে তোমাকে সব দেখাইব।" তাহার পর কুসুম বলিল, "সৌদামিনী দিদি আমাকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তিনি আমার পেট চিরে খাওয়াইয়াছেন। কত মাছ যে এনেছিলেন! আর পোলাও মাংস কত রকম করেছিলেন। দিদি বলেছেন, তিনি হাজারবাগ যাবেন। যদি তিনি একবার হাজারিবাগ যান, তবে দিদিকে মনের মত খাওয়াব।"

আমি কুসুমকে বলিলাম, "ক'ল্‌কাতা কেমন সুন্দর!" কুসুম বলিল, "হাজারিবাগের মত নয়, এখানে কয়েক খানা ইটের দালান মানুষে বানায়েছে, আর হাজারিবাগে কত পাহাড় এবং কেমন প্রকৃতির শোভা!"

রাজখাড়া ষ্টেসনে পূর্ণ বাবুর লোক ছিল না। আমি কুসুমকে নিয়া কামারগাঁ গেলাম। আমাদের বাড়ী দোল হয়। সে দিবস দোলযাত্রা। কুসুম বুদ্ধি হওয়ার পর আর কখনও আমাদের বাড়ীর দোল দেখে নাই। এবার দোল দেখিয়া কুসুমের আনন্দের সীমা রহিল না। অনেক সমবয়স্কা বালিকা কুসুমের সঙ্গে খেলায় যোগ দিল। তাহার পর দিবস আবিধারা হইতে লোক আসিল। কুসুম বলিল, "আমি আজ যাব না, আজ ছুলি; আমি এখানে ছুলি দেখ্‌ব।" আমি বলিলাম, "আজ না গেলে তোমার শ্বশুর অসন্তুষ্ট হ'বেন।" কুসুম আর দ্বিরুক্তি করিল না, তখনই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এই শ্লোকটির মর্ম্ম কুসুম হৃদয়ের সহিত কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। তাহার জীবনে কখনও সে আমার কথা অবহেলা করে নাই। আমি তাহার সঙ্গেই হাজারিবাগ যাত্রা করিয়াছিলাম। কুসুম আবিধারা গেল, আমি হাজারিবাগ পৌঁছিলাম।

কুসুম আবিধারা যাইয়া চন্দ্রমাধব বাবু কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়াছিল। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন—

করসিয়ং।
৪ঠা এপ্রিল।

কল্যানীয়াসু—

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই পত্র পাওয়ার পরেই আমি কলিকাতা হইতে উপরের লিখিত স্থানের উদ্দেশে

যাত্রা করি, তাহাতেই উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে কিছু মনে করিবা না। তোমার পত্রের বিবরণ সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছি। আমি হাইকোর্ট কয়েকদিন বন্ধ থাকা উপলক্ষে এখানে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছি, আগত মঙ্গলবার কলিকাতা উদ্দেশে পুনরায় যাত্রা করিব।

আমার জন্ম বিক্রমপুর ষোলঘর গ্রামে হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষা কলিকাতা হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজে হইয়াছিল। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি এক প্রকাণ্ড কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমরা একপ্রকার ভাল আছি। তুমি ও জামাতা কেমন আছ ও আছেন ও তাঁহার সহিত সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, লিখিবা ইতি।

আং—শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ।

এই সময় যোগেশ এফ্ এ পাশ করিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের বন্ধে আমি বাড়ী যাব না স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসেই বৈবাহিক মহাশয় জানাইলেন, কুসুমের তিন মাস অন্তরাপত্য। পত্র পাঠ করিয়াই শরীর সিহরিয়া উঠিল। সেই জ্যৈষ্ঠমাসে কুসুমের মাত্র বার বৎসর দশ মাস বয়স। সে বৎসর হাজারিবাগে অনেক বালিকা প্রথম প্রসব সময় প্রাণত্যাগ করে এবং অনেক দূর রেল পুষপুষে চাপিলে যদি কোন অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় কুসুমকে স্থানান্তর করিব না স্থির করিয়া তাহার প্রসূতিকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

শ্রাবণ মাসে কুসুমের জ্বর হইল, তাহা সামান্য কবিরাজি ঔষধে সারিয়া গেল। পুনরায় ভাদ্র মাসে মাজার বেদনা, জ্বর এবং আনুসঙ্গিক অনেক উপদ্রব দেখা দিল। কুসুমের প্রসূতি তাহাকে নিয়া ঢাকাতে গেল। সেখানে একটুকু সুস্থ হইলে ডাক্তার কুসুমকে গ্রামে

নিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। তাহার প্রসূতি তাহাকে নিয়া পুনরায় আবিধারা গেল। পথেই কুসুমের জ্বর ও মাজার বেদনা আরম্ভ হইল। আবিধারা যাইয়া কুসুম আশ্বিন মাসে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিল। কন্যাটি মাত্র এক দিবস জীবিত ছিল। কুসুম অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; কিন্তু কাতরতা প্রকাশ করিল না।

আশ্বিন মাসের শেষ ভূপতি সহ আমি আবিধারা গেলাম। সকলে কুসুমকে জাহাজে কামারগাও নিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু তখন কুসুমের জাহাজে উঠিবার শক্তি ছিল না। দুই দাঁড়ের নৌকাতে চারিদাঁড় লাগাইয়া কুসুম সহ আমি ২রা কার্ত্তিক বাড়ী গেলাম। পূর্ণবাবু কুসুমের সঙ্গে ছোডাওয়াটার এবং ব্রাণ্ডি দিলেন। বাটীতে যাইবার সময় কুসুমের অত্যন্ত রক্তস্রাব হইল। তাহার পর দিবস কুসুমের জ্বর হইল। জ্বর একশত দুই ডিগ্রী হইয়াছিল।

জ্বরান্তে আমি কুইনাইন দিতে চাহিলাম; কিন্তু ডাক্তার দিলেন না। দুই দিবস পরে কুসুমের এক শত ছয় ডিগ্রী জ্বর হইল। আমরা সকলেই অত্যন্ত আশঙ্কিত হইলাম। আমি ডাক্তারকে বলিলাম, "কুসুম অত্যন্ত দুর্ব্বল। এই জ্বর ছাড়িবার সময় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে। অতএব ইহাকে কস্তুরী দেন। ডাক্তার তাহাই করিলেন। সেই দিবস জ্বর ছাড়িল না, এক শত ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিল; কিন্তু কুইনাইন দিতে পারিলাম না। তাহার পর দিবস পুনঃ এক শত ছয় ডিগ্রী জ্বর হইল। কুসুমের কখন প্রাণ বাহির হয়, সকলেরই এই আশঙ্কা হইল। দুইজন ডাক্তার দেখিতেছিল, তথাপি আমি মেদনীমণ্ডল হইতে চন্দ্রকান্ত সেন কবিরাজকে আনাইলাম। তিনি কুসুমের চিকিৎসা করিতে সাহস করিলেন না এবং বলিলেন এই সময় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত।" পূর্ব্ব দিবস হইতেই কুসুমের প্রসূতি,

তাহার পিসীমা, তাহার দুই খুল্লতাত লালমোহন ও রাসমোহন এবং একটি জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, জলদা ও আমি দিনরাত্রি কুসুমের নিকটে থাকিতাম।

শ্যামাচরণ ডাক্তার দিনের মধ্যে অনেকবার এবং রাজমোহন ডাক্তার কোন কোন সময় কুসুমকে দেখিতে আসিত। কুসুমের জিহ্বা গোজিহ্বার মত, পিপাসা অত্যন্ত, শরীর প্রায় রক্তশূন্য এবং জ্বর প্রায় এক শত ছয় ডিগ্রী। কখন তাহার প্রাণ বাহির হইবে, আমরা তাহাই ভাবিতেছি। রাত্রি বারটার সময় জ্বর এক শত তিন ডিগ্রী হইল। ডাক্তার মিশ্রিত কুইনাইন পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন, তাহাই সেবন করাইলাম। কুসুম যাহা আহার করিয়াছিল, বমি হইয়া পড়িয়া গেল। রাত্রি পাঁচটার সময় কুসুম বলিল, "আমায় কেমন করে।" আমি ভাবিলাম ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে। অমনি আমি বিশ্বজননীর নাম স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সতীন্দ্রকে ডাকিলাম ও তাহাকে গাভী দোহন করিতে বলিলাম। সে নক্ষত্রবেগে একটি ঘটী হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং বৎসটি স্কন্ধে করিয়া গাভীর নিকট গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গাভী দোহন করিয়া সতীন্দ্র দুগ্ধ আমার হস্তে দিল। সেই দুগ্ধ কুসুমের প্রসূতি গরম করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। কুসুম সুস্থ হইল। সেই দিবস কুসুমের জ্বর একশত দুই ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিল। তাহার পর বাড়িয়া একশত তিন ডিগ্রী হইল। তাহার পর দিবস একশত এক হইল। ক্রমে এই প্রকার জ্বর কমিতে লাগিল। জ্বর ছাড়িবার দুই দিবস পরেই অন্নপথ্য দেওয়া হইল। জ্বর পুনঃ বৃদ্ধি পাইল। তৎপর অন্ন বন্ধ করিয়া সুপ, পোর্ট, দুগ্ধ, সাগু ও মধ্যে মধ্যে বেদানা এবং পানের জন্য ছোডাওয়াটার দেওয়া হইত। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না, সেজন্য গ্লিসারিন এবং কেস্-

কারা দেওয়া হইত, তাহাতেও সকল সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না। রক্তস্রাব নিবারণ জন্য হেজেলিন দেওয়া হইত। কুসুমকে এই অবস্থায় রাখিয়া আমি হাজারিবাগ রওনা হইলাম।

আমি হাজারিবাগ পৌঁছিয়া চারি দিবস পরে বাটীর পত্রে জানিলাম, কুসুমের ভয়ানক রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া হাত পা শীতল হইয়াছে। ঢাকাতে অভয় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিল। তাহার প্রতি কুসুমের বিশ্বাস ছিল; এজন্য তাহাকে আনিতে ঢাকাতে লোক গিয়াছে। আমি পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ হাজারিবাগের সিবিল সার্জ্জন ডিয়ার সাহেবের নিকট গেলাম এবং সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তিনি আর্গট আর কি কি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন খানা ডাকে পাঠাইয়া দিন এবং আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করুন যে, রোগীর অন্ন বন্ধ করিয়া তাহাকে সাগু, দুগ্ধ, পোর্ট ও সুপ আহার দেওয়া হয় এবং কোন প্রকার শরীর সঞ্চালন না করে। শরীর সঞ্চালন করিলেই রক্তস্রাব হইবে।' আমি তাহাই করিলাম। তাহার দুই দিবস পরে চিঠিতে জানিলাম, অভয় ডাক্তার কোন মোকদ্দমার জন্য আসিতে পারে নাই। কয়েক জন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন কুসুমকে ঢাকাতে নিতে বলিয়াছে। তখন আমার চক্ষু স্থির হইল, ভাবিলাম কুসুমের প্রাণ গিয়াছে। কিন্তু চিঠিতে লিখা ছিল, যাইবার পূর্ব্বে আমার নিকট টেলিগ্রাম করিবে। তখনও আমি টেলিগ্রাম পাই নাই। আমি অমনি টেলিগ্রাম করিলাম, "কুসুমকে কিছুতেই ঢাকা নিওনা।" তাহার পর বুধবার চিঠি পাইলাম—শনিবার কুসুমকে ঢাকাতে নিবার কথা ছিল। কিন্তু শুক্রবার রাত্রি হইতে রবিবার পর্য্যন্ত এত ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল যে, কিছুতেই কুসুমকে ঢাকাতে নিতে পারি নাই। কুসুম অনেক সুস্থ হইয়াছে। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

তিনি ঝড় বৃষ্টি দ্বারা কুসুমের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এখানকার মিশ হেজার্ডের পরামর্শমত আমি বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। কুসুমের শয়নের খাট যেন মাথার দিক হইতে পায়ের দিক সামান্য উঁচু থাকে। এরূপ অবস্থাতে কুসুমকে পালকিতে, নৌকাতে, রেলে ও ঘোড়-গাড়ীতে ঢাকায় নেওয়ার চেষ্টা করিলে পথেই কুসুমের প্রাণান্ত হইত। ভগবান্ অলৌকিক উপায়ে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ডিয়ার সাহেবের ব্যবস্থাপত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহাকে আর্গট দেওয়া হইয়াছিল। তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার ও শরীরে রক্ত সঞ্চারের জন্য ডিয়ার সাহেব ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে সুন্দর ফল হইয়াছিল।

কুসুমের যখন অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া হাত পা শীতল হইয়াছিল, তখন কুসুম বলিয়াছিল, "মা! আমাকে দুধ দাও।" কুসুম দুগ্ধ পান করিল এবং অনেকে কুসুমের হাতে পায়ে তার্পিন মালিষ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে কুসুম সুস্থ হইল।

কুসুমের এত অসুখ, কিন্তু এক দিনও সে ব্যস্ত হয় নাই, কিম্বা কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ করে নাই। পীড়িতাবস্থায়ও সকলের সঙ্গে সহাস্যবদনে কথা বলিয়াছে।

যোগেশ আষাঢ় মাস হইতে ঢাকাতে ছিল। তাহার প্রতিমাসে একবার জ্বর হইত। নবেম্বর মাসে তাহার দুইবার জ্বর হইল। তখন তাহাকে কলেজ হইতে নাম উঠাইতে লিখিলাম। সে বাড়ী যাওয়ার সময় কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিল। মাঘ মাসের প্রথম ভাগে যোগেশ ও পূর্ণ বাবু হাজারিবাগে আসিয়াছিলেন।

কুসুমকে পীড়িতাবস্থায় দেখিবার জন্য তাহার মাতুল বাড়ী হইতে অনেকে অনেক বার আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের তৃপ্তি হয় নাই। যখন কুসুম একটুকু সুস্থ হইল, তাহার মাতুল বাড়ীর সক-

লেই তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তাহাকে সকলেই অত্যন্ত ভাল বাসিত। কুসুম তাহার মাতুল বাড়ী প্রায় বার তের দিবস ছিল।

মাঘ মাসের শেষভাগে জলদা, কুসুম, তাহার প্রসূতি এবং মোহিনী হাজারিবাগ আসিল। যোগেশের জ্বর তখন ছাড়িয়াছিল। কুসুম ও তখন অনেকটা সুস্থ। আমরা তখন আনন্দ সাগরে ভাসিলাম।

এই সময়ে গিরীন্দ্রবাবু পেন্‌সন্‌ নিয়া একটুকু দূরে বাসা করিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু ফাল্গুন মাসের প্রথম যোগেই হাজারিবাগ হইতে গিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রবাবু যোগেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া কাপড় দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের দিবস কুসুমের জলবসন্ত ছিল। সে নিমন্ত্রণে না যাইতে পারাতে গিরীন্দ্রবাবু ও তাহার স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কুসুম ভাল হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। গিরীন্দ্র বাবুর মৃত্যু সময়ে তিনি অত্যন্ত যাতনা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে জন্য একটুকুও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কেহ তাঁহাকে যাতনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "যীশুখৃষ্ট যে যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে, এ যাতনা কিছুই নহে।" কুসুম সেই কথা শুনিয়াছিল এবং তাহার প্রসূতিকে অনেক সময় বলিত, "যীশুখৃষ্টকে পাপী লোকেরা কত কষ্ট দিয়া ক্রুশে চাপিয়া মারিয়াছিল। কিন্তু তিনি অকাতরে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন এবং সেই পাপীদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

যোগেশের এখানে বাস সময়ে কুসুম তাহার জন্য কি কাজ করিবে তাহা অনুসন্ধান করিত। মাংস পাক শিক্ষা করা উপলক্ষ করিয়া মাংস পাক করিত, তাহার পছন্দ মত কুটনা কুটিত এবং তাহার পাঠের কোঠার চিমনি, টেবল ও চেয়ার পরিষ্কার করিত।

বর্ষা সময়ে তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ পাকিয়াছিল। এখানকার নেটিব ডাক্তার বসন্তবাবু অস্ত্র করিয়া সমস্ত পিক বাহির করিয়া লিণ্ট ভরিয়া দিলেন। কুসুম অশ্রুপাত না করিয়া ডাক্তার যাওয়ার পর খাটের উপর শুইয়া রহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুসুম তুমি শুয়ে র'লে কেন?" সে উত্তর করিল, "আঙ্গুলে বড় বেদনা ও জ্বালা।"

কুসুমের হাতের লেখা খুব পরিষ্কার এবং অক্ষর গুলি ঠিক ছাপার অক্ষরের মত ছিল। সে অতি দ্রুত লিখিতে পারিত। পুস্তক কিম্বা পত্রিকা অতি সুন্দর পাঠ করিত।

১৯শে চৈত্র শৈবলিনীকে লিখিয়াছিল—

হাজারিবাগ।
১৯শে চৈত্র।

অভিন্নহৃদয়াসু—

প্রাণের দিদি! গত পরশ্ব তোমার মধুমাখা চিঠিখানা পাইয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কত লিখিব। আশা করি মধ্যে মধ্যে এইপ্রকার দুই এক খানা পত্র লিখিয়া তোমার স্নেহের কুসুমকে সুখী করিবা।

দিদি মণি! আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি বুঝি আমাকে ভুলিয়া গেলে। এখনও আমাকে দেখিতে তোমার এত আগ্রহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হইবে না। এবার

বড় আশা করিয়াছিলাম যে, তোমার সঙ্গে বুঝি দেখা হইবে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল। সতীশবাবু তোমাকে ছাড়িয়া দিলেন না।

দিদি! সতীশবাবুকে বলিও আমার কাছে পত্র লিখিতে। তিনি কি এতই বড়মানুষ হইয়াছেন যে, আমাদের কাছে চিঠি লিখিতে অপমান বোধ হয়? আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। যদি উত্তর না পাই, তবে বড় দুঃখিত হইব এবং বোধ হয় তাহা হইলে এই শেষ লেখা। অধিক আর কি লিখিব। তোমার শ্বশ্রূমাতাকে আমার প্রণাম জানাইবা। বিয়াইনেরা কেহ এখানে থাকিলে তাঁহাদিগকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবা। তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ করিবা। আমার শরীর বড় ভাল নয়। মাঝে মাঝে জ্বর হয়; বড় দুর্ব্বল। তোমার ও তোমার সতীশবাবুর কুশল চাই। দাদা ভাল আছে। সে তোমার চিঠির উত্তর এখন দিবে না বলিল; বোধ হয় শেষে দিতে পারে ইতি।

তোমার স্নেহের কুসুম।

পুঃ—

দিদি!

তোমার ভগ্নিপতি এখানে আছেন। ভালই আছেন।

বৈশাখ মাসের শেষভাগে যোগেশ বাড়ী গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে কুসু-

মের শরীর কিছু সুস্থ হইল; কিন্তু আম জাম খাওয়াতে কিছু কফের সঞ্চার হইল। ডাক্তার হারন্ সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতেই অসুখ সারিয়া গেল। তাহার পেটে বেদনা হইয়াছিল। হারন্ সাহেবের ব্যবস্থীকৃত ঔষধে তাহা দূর হইল। এবং তাঁহারই ব্যবস্থামত তাহাকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কড্লিভার অয়েল এবং মধ্যে মধ্যে কুইনাইন দেওয়া হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কুসুম এক দিবস বলিল, "বাবা, আমি শিল্প কাজ শিখ্ব, মিসবিলকে আনিয়া দেও।" আমি মিসবিলকে অনুরোধ করাতে তিনি প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন কুসুমকে নানাবিধ শিল্পকাজ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন, "আপনার কন্যা অতি বুদ্ধিমতী; যে কাজ এক দিবস শিক্ষা দেই, তাহা অমনি শিখিতে পারে।" কুসুম আমার জন্য একযোড়া ও তাহার ননদের ভাবী সন্তানের জন্য একযোড়া উলের মুজা প্রস্তুত করিয়াছিল। লেইচ্ ও নানাবিধ রুমাল ও টেবল রুমাল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। সেলাই কাজ আপনিই শিক্ষা করিয়াছিল। আমার চাপকান কোট প্রভৃতির বুতাম নিজেই লাগাইয়া রাখিত।

কুসুমের চিত্র বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিনা উপদেশে কুসুম নানাপ্রকার চিত্র আঁকিয়াছিল। রেট্রে নামক একটি সাহেব পূর্ব্বে পুলিষের সুপারিণ্টেণ্ড ছিলেন। তিনি পেন্‌সন্ নিয়া পরিবার সহ হাজারিবাগে বাস করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যা দিগকে এক দিবস হ্রদের পাড়ে বৃক্ষাদি চিত্র করিতে দেখিয়া বলিলাম, "আমার কন্যার চিত্র বিদ্যাতে বিশেষ অনুরাগ। সে বিনা উপদেশে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা ও ছোট ছোট বৃক্ষ চিত্র করে। তাহাকে কেহ এ বিষয়ে উপদেশ দিলে, বিশেষ অনুগৃহীত হইতাম।" তিনি বলিলেন,

"মিস হোয়াইট ভাল চিত্র বিদ্যা জানেন, আপনি তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি অতি আনন্দের সহিত আপনার কন্যাকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন।" আমি কুসুমকে সমস্ত বিষয় বলাতে তাহার আনন্দের অবধি রহিল না।

পূর্ণবাবু বাড়ী যাইয়া কুসুমের নিকট চিঠি লিখিলেন, "এখন আমি তোমাদিগকে রাখিয়া যাইতে পারিলেই হয়।" এই চিঠি শুনিয়া কুসুমের প্রসূতি বলিল, "পূর্ণবাবু কুসুমকে খুব ভাল বাসেন। শ্বশুর সাধারণতঃ পুত্রবধূকে এমন ভাল বাসে না। আমি যখন আবিধারা ছিলাম, পূর্ণবাবু এক দিবস একটি ভাল পাকা ডালিম আনিয়া তাহা কেটে প্রথমে কুসুমকে এক অংশ দিলেন, পরে অবশিষ্ট অংশ তাহার স্ত্রীর হাতে দিলেন।"

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হাজারিবাগে প্রচণ্ড রৌদ্র হয়। সমস্ত জিনিষ শুষ্ক হয়। গুবাক শুষ্ক হওয়াতে অত্যন্ত কঠিন হয়। কুসুমের প্রসূতি এক দিবস বলিল, "সুপারিগুল এত শক্ত যে কাটিতে পারি না।" কুসুম বলিল, "মা! জলে ভিজাইয়া রাখ, কাট্‌তে সুবিধা হইবে।" কুসুম বেশ সুপারি কাটিতে পারিত।

চৈত্র মাস হইতে দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত কুসুম প্রায়ই একদিন অন্তর এক দিন মাংস পাক করিত। সে মাংস অতি সুস্বাদ হইত। পূর্ণবাবু কুসুমকে একখানা পাকপ্রণালী দিয়াছিলেন। কুসুম সেই গ্রন্থ দর্শন করিয়া অনেক দিন নানাবিধ সন্দেশ, রসগোল্লা, পলান্ন, চপ, কুর্ম্মা প্রভৃতি পাক করিত এবং তাহার প্রসূতিকে বলিত, "মা! এই বেলা সব পাক করা শিখে রাখ।"

এক দিবস দ্বিজেন্দ্র কুসুমকে একটি স্তব শুনাইল। কুসুমও একটি স্তব পাঠ করিল। দ্বিজেন্দ্র বলিল, "তোমার স্তবটি অত্যন্ত বড়; আমার মনে থাকিবে না। তুমি লিখিয়া দেও।" কুসুম তখন লিখিয়াদিল।—

নমস্তে সর্ব্বানী, ঈশানী, ইন্দ্রানী, ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া,
অপর্ণে অভয়া, অন্নপূর্ণাজায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
উগ্রচণ্ডা উমে, আশুতোষি ধূমে, অপরাজিতা উর্ব্বশী
রাজরাজেশ্বরী, রামা রণকরি, শঙ্করী, শিবে ষোড়শী,
মাতঙ্গী বগলে. কল্যাণী কমলে, ভবানী ভুবনেশ্বরী,
সর্ব্ববিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী, ক্ষতি ক্ষেত ক্ষেমঙ্করী,
সহস্রসহস্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে, মাতা মহিষমর্দ্দিনী,
নিস্তারকারিণী, নরকবারিণী, নিশুম্ভশুম্ভ ঘাতিনী,
দৈত্য নিকৃন্তিনী, শিবসীমন্তিনী. শৈলসুতা সুবদনী,
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, তুষ্ট নিষ্কন্দিনী, দিগম্বরের ঘরণী,
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ অরি, কালিকে করালবেশী,
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, ঘোররূপা এলোকেশী,
সর্ব্বসুশোভিনী, ত্রৈলোক্যমোহিনী, নমস্তে লোলরসনা,
দিকবিবর্ণনা, সর্ব্বপরসনা, বিশ্বা বিকটদশনা,
সারদা, সুখদা, বরদা, শুভদা, অন্নদা মোক্ষদায়িনী,
মৃগেশবাহিনী, মহেশভাবিনী, সুরেশ-বন্দিনী বামা,
কামাক্ষা রুদ্রাণী, হরাষড়াননী, মহামায়া, কাত্যায়নী,

হের মা পার্ব্বতী, আমি দীনা অতি, আপদে পড়েছি বড়,
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্রজল, ভয়ে ভীতা জড়সড়।

শ্রীমতী কুসুমকামিনী।

কুসুম বৃথা সময় নষ্ট করে নাই। কোন সময়ে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত, কখন সঙ্গীত লিখিত, কখনও গৃহকার্য্য সম্পাদন করিত কখন বা অন্যের চিঠি লিখিত। এক দিবস যাহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, এমন লোকের নিকটেও কুসুম চিঠি লিখিয়াছে। লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা ও বেড়ান তাহার বড়ই প্রিয় কার্য্য ছিল। এখানে অনেক পাহাড় দেখাইবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহার সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারি নাই। কি কারণে তাহার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারি নাই, তাহাকে বলাতেই সে সন্তুষ্ট রহিয়াছে, আর কখনও সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করে নাই।

কুসুম এক দিবস চঞ্চলাদের বাটী যাইয়া দেখে, তাহারা সকলে উপাসনা করিতেছে। উপাসনান্তে কুসুম বলিল, "মামী মা! আমরা যাহা ইচ্ছা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি। কিন্তু আমাদের এরূপ আশা করা উচিত নহে যে, যাহা আমরা প্রার্থনা করিব, তাহাই তিনি দিবেন। আমরা কাজ করিয়া যাহার জন্য উপযুক্ত হইব, তাহাই তিনি দেন।"

একদা শান্তি, কালজাম প্রভৃতি আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিয়াছিল। শান্তিকে ভীমরুলে দংশন করাতে তাহার মূর্চ্ছা ও শরীর স্ফীত হইল। কুসুম দংশন স্থলে তামাক দিয়া তাহার মস্তকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বাসায় গেল। সে

যে পর্য্যন্ত আরাম না হইয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য কুসুম আমাকে তাহার বাসায় প্রত্যহই পাঠাইয়াছিল।

কুসুম সঙ্গীত প্রিয় ছিল; কিন্তু অশ্লীল গান কখনও করে নাই কিম্বা শোনে নাই। তাহার গানের একখানা খাতা আছে। তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। ১ম ধর্ম্মসঙ্গীত, ২য় অন্যান্য বিবিধ গান এবং ৩য় হাসি ও খেলা। যখন যে গানটি ভাল বোধ হইত, তাহাই সেই খাতায় লিখিয়া রাখিত। রাত্রিতে আহারের পর যখন শয়ন করিত, তখন প্রায়ই ধর্ম্ম বিষয়ে গান করিত। তাহার প্রসূতি ও তাহার সঙ্গে গান করিত। তাহার প্রসূতির কোন সময় তাল মান ঠিক না হইলে, তাহা বলিয়া দিত। কোন গান একবার শুনিলেই তাহার তাল স্বর ঠিক করিতে পারিত। এক দিবস একটি শ্লোক পাঠ করিয়া আমাকে বলিল, "বাবা, সা রে গা মা নি ধা পা, ইহার প্রত্যেক অক্ষর একএকটি সুরের প্রথম অক্ষর।" আমার আর কোনটি মনে নাই, কেবল গান্ধারের গা, এই মাত্র মনে আছে।

বর্ষার সময় পূর্ণবাবু চিঠি লিখিলেন,—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যতীশের কোন সংবাদ পান নাই। বোধ হয় সে জীবিত নাই। এই আশঙ্কায় তাঁহার বহুমূত্র রোগ হইয়াছে এবং মাথা ঘোরে। কুসুমকে যতীশ "আমার বধূঠাকুরাণী" বলিয়া সম্বোধন করিত। কুসুমও তাহাকে খুব ভাল বাসিত। একবার তাহার জন্য এক যোড়া উলের মুজা প্রস্তুত করিয়াছিল। যতীশের আরোগ্য সংবাদ পূর্ণবাবু পাইলেন; কিন্তু তাঁহার রোগ কিছুকাল স্থায়ী হইল। পূর্ণবাবু কুসুমকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। এমন কি তাঁহার আপন কন্যা অপেক্ষাও তিনি কুসুমকে অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যখন তাঁহার বাগানে আম, লিচু, ডালিম কিম্বা অন্য কোন ফল প্রথম পাকিয়াছে, পূর্ণ বাবু আপন হস্তে

সেই ফল নিয়া প্রথমেই কুসুমকে দিয়াছেন। পার্শি সাড়ী কিম্বা অন্য কোন প্রকার বসন যখন পূর্ণবাবু তাঁহার কন্যা ও কুসুমকে দিয়াছেন, তখন তিনি ভাল খানা কুসুমকে দিয়াছেন। পূর্ণবাবু দুইটি রূপার সিন্দূরের কৌটা কিনিয়া তাহার ভালটি কুসুমকে দিয়াছিলেন। কুসুম তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। গল্পচ্ছলে কেহ তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দা করিলে, সে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। তাহার প্রসূতি কি কথা উপলক্ষে এক দিবস তাহার শাশুড়ীকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। কুসুম বলিল, "তুমি আমার শাশুড়ীকে এরূপ ভাবে ঠাট্টা করিও না। গুরুজনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়।" এ সংস্কার তাহার শিশুকাল হইতে ছিল।

এক দিবস একটি গর্ভবতী কুকুরী অনাহারে কাতর হইয়া আমাদের বাসায় আসিল। কুসুম তাহার শীর্ণতা দেখিয়া স্বহস্তে তাহাকে আহার দিতে আরম্ভ করিল। সে কুকুরী এখনও আমার বাসায় আছে।

ভাদ্র মাসে হঠাৎ এক দিবস আমার মাথা ঘুরিল। হারণ্ সাহেবকে দেখাইলাম। তাঁহার ব্যবস্থীকৃত ঔষধে ভালরূপ ব্যারাম দূর হইল না। ভাবিলাম, কলিকাতা হইতে কবিরাজি ঔষধ আনিয়া সেবন করিব। আমার জ্বর কিছু কমিয়াছিল; কিন্তু সময় সময় মাথা ঘুরিত। আমার শরীর যেন ভগ্ন হইয়া পড়িল।

পূর্ণ বাবুর ব্যারামের কথা শুনিয়া কুসুম তাঁহাকে দেখিবার ও সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। সে আবিধারা যাইবার জন্য জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, সে পূজার সময়ে আবিধারা যায়। ভয়ানক পীড়া হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তথনও ঔষধ সেবন করে, শরীর ভাল করিয়া সুস্থ হয় নাই, এ অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে আমার নিকট থাকাই ভাল। সেই জন্য আমি

এক দিবস কুসুমকে বলিলাম, "তোমার শ্বশুর যদি তোমাকে পাঠাইতে না লিখেন ?" কুসুম বলিল, "তবে কেমন হবে ?" আমি ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম, কুসুমের যেমন আগ্রহ দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে আবিধারা যাইতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কয়েক দিবস পরে পূর্ণবাবু লিখিলেন, "কুসুমকে শারদীয়া পূজার সময় দিয়া গেলে সুখী হইব"। কুসুম আনন্দে পুলকিত হইল এবং আমাকে বলিল, "বাবা, গত বার যখন চন্দ্রমাধব বাবুর বাসায় যাই, তখন পথে আমাদের চা খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল না। তোমার ও আমার মাথা ধরে ছিল। তুমি মাথার বেদনায় অস্থির হইয়াছিলে। আমরা চা খাওয়া ক্রমে ছেড়ে দিব। প্রতিদিন কুসুম গরম জলে কম চা দিয়া এক দিবস কিছুমাত্র চা দিলে না। তদবধি আমাদের চা খাওয়ার অভ্যাস দূর হইল।

৩রা ভাদ্র কুসুম জলদার স্ত্রীকে লিখিয়াছিল,—

হাজারিবাগ।

৩রা ভাদ্র।

শ্রীহরিসহায়।

প্রাণের ভগিনি !

এই মাত্র তোমার পত্রখানা পাইলাম। আমি তোমার পত্র পাইলে সুখী হই ; কিন্তু তোমার এই পত্র পাইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখিত হইলাম। ভগিনি ! তুমি এই বয়সেই সাংসারিক যত রকমের কষ্ট আছে, তাহা ভোগ করিলে। প্রিয়তমে ! সংসারে কেহই সুখী নয়, ইহা স্থির জানিও। তবে পূর্ব্বজন্মের ফলাফল

অনুসারে কারো দুঃখের মাত্রা গুরু, কারো লঘু, এই মাত্র ব্যতিক্রম। নচেৎ দুঃখ সকলেরই আছে। তুমি অস্থির আছ, ইহা আমি খুব বুঝি। তথাপি ভগিনি! কষ্ট পাইয়া মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। সহিষ্ণুতাই স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন। সহিষ্ণু হও। মনে করিও না বোন্! যে আমিই বড় সুখে আছি। আমিও দারুণ মনঃকষ্টে আছি। তোমাদের যোগেশ বাবু আমার কাছে চিঠি লিখা একরূপ বন্ধ করিয়াছেন। বোন্! গতবার চারি খানি চিঠি লিখিয়া এক খানির উত্তর মাত্র পাইয়াছিলাম। এবার তিনখানা লিখিয়াছি, কিন্তু একখানিরও উত্তর পাই নাই। মন কত সময় কত রূপ বলে; কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তথাপি সরোজ! তিনি বিনা দোষে আমাকে এত কষ্ট ভোগ করাই-তেছেন, ইহা ভাবিয়া বড় কষ্ট পাই। আমার অপরাধ কি, তাহা কত পত্রে জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহাও লিখেন না। ভগিনি! স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা কষ্ট আর কি আছে? তিনি সুস্থ শরীরে ও শান্তিতে থাকুন, ঈশ্বরের কাছে ইহাই প্রার্থনা। বাবার কাছে একখানা কার্ড লিখিয়াছেন। তাহাতে জানিয়াছি, তিনি ভাল আছেন। ইহাই আমার পরম সুখ।

আমি তোমার কাছে কামারগাঁর ঠিকানায় পত্র লিখিয়াছি। তুমি বোধ হয় পাও নাই। তোমার সহিত দেখা করিবার আশা আমার দুরাশা মাত্র। আমি বোধ হয় ৵ পূজার সময় আবিধারা যাইব। বাটী হইয়া (যদি ভগবানের কৃপায়) যাইতে পারি, তবে ত দেখা হইবে? ঠাকুর ভাইর পত্র পাইয়াছি। তিনি ভাল আছেন। প্রাণাধিকে! তোমার বধূঠাকুরাণীকে যখন পাক করিয়া দিবার লোক নাই, তখন তুমি কিছু দিন থাকিলে তিনি যে রাগ করিতেন, ইহা আমার বোধ হয় না। তোমার বধূঠাকুরাণী কাজ কর্ম্মে কেমন? পরিশ্রমী না আমারই মত অকর্ম্মা? সুন্দরী বধূ আনিয়াছ, শুনিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার নাম "প্রফুল্লকুমারী" সদা হাস্যমুখী তো? আমি হাস্যমুখী স্ত্রীলোক বড় ভালবাসি। তাঁহাকে আমার সাদরসম্ভাষণ জানাইও। আশা করি তুমি ও আমি যেমন অকৃত্রিম প্রেমডোরে বাঁধা আছি, সেইরূপ তোমরা উভয়ে থাকিবে। কিন্তু ভগিনি! সকলের সঙ্গে মনের মিল একরূপ হয় না। ঈশ্বর করুন, তোমার সঙ্গে যেন আমার দেখা হয়। তাহা হইলে জানিতে ও জানাইতে পারিব।

আমার শ্বশুর বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আমার দেবর জ্যোতিষের বড় ব্যারাম। ছোট খুড়ী কোথায় আছেন ও কেমন আছেন, জানকি? যদি জানিয়া থাক, তবে আমাকে জানাইও। চুণী মরিয়াছে। মৃত্যু কাহারও হাতধরা নহে। চিনি দাদার উচিত হয় নাই, চুণীকে না দেখিয়া আসা। তিনি যখন পোড়ার চিকিৎসা জানেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসা উচিত ছিল। যাহৌক গতস্য শোচনা নাস্তি। গত বিষয়ের আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। তুমি কেমন আছ? আমরা ভাল আছি। ইতি।

তোমারই কুসুম।

১৭ই ভাদ্র কুসুম জলদার স্ত্রীকে লিখিয়াছিল—

হাজারিবাগ।

১৭ই ভাদ্র।

প্রিয়তমে ভগিনি!

এই মাত্র তোমার সুকোমল হস্তের মধুমাখা লিপি প্রাপ্তে অপরিসীম সুখী হইলাম। প্রাণের বোন্! সর্ব্বদা এই প্রকার পত্রাদি দানে তোমার স্নেহের ভগিনীকে সুখী করিতে অন্যথা করিও না। ভগিনি! তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা

করিব? কখনও না। বোন্! তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া যে গোপনীয় কথা বলিবে, আমি প্রাণ থাকিতে সে সব কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা তুমি জান। সুতরাং তোমার নিকট বেশী লিখা বাহুল্যমাত্র।

প্রিয়তমে! তোমার মন কিপ্রকার করে? কিছুই কি বুঝিতে পার না? তবে কি তুমি সত্য সত্যই পাগল হইলে? ঠাকুর ভাই জানেন কি? তাঁহাকে বিশেষ করিয়া সব কথা বলিও। সরোজ! আমার ইচ্ছা হয়, পাখা হইয়া উড়িয়া গিয়া তোমাকে সব কথা বলি ও শুনি। আমি ৵ পূজার সময় বাড়ী গিয়া তোমার সহিত দেখা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তোমার সহিত কথা বলিয়া আমার মন যত ভাল বোধ হয়, এমন আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিয়া হয় না। আমি যদি ভগবানের কৃপায় কামারগাঁ তোমার নিকট যাইতে পারি, তবে এক বার সব কথা বলিতে পারিব। ভাই! তোমাদের যোগেশ বাবু অদ্য সাত আট দিন হয়, আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'আমার পত্র অনেক দিন হয় পান না; সে জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। আর আমি তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার দয়া মায়া নাই।' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি

তাঁহাকে চারিখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। শেষ পত্র খানিতে একটুকু অনুযোগ লিখিয়াছিলাম। ভগিনি! আমি আমার ব্যবহারে কোন ত্রুটি করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তিনিও আর কোন দিন এইরূপ ব্যবহার করেন নাই। এবার যদি সত্য সত্যই আমার পত্র না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার দোষ বৃথা দিয়াছি। আমারই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি দাদার পত্রে জানিয়াছেন যে, আমি ভাল আছি। আমি ভাল থাকিয়াও তাঁহার সংবাদ লই না, ইহা জানিয়াও যে তিনি চিঠি লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু তিনি বোধ হয় আমার সব চিঠি পাইয়াছেন। কারণ আমি যে ঠিকানায় চিঠি লিখিয়াছি, তাহাতে নাপাইবার কোন কারণ নাই। বোধ হয় তিনি নিজে অনুযোগের হাত এড়াইয়া আমাকে উল্টা অনুযোগ দিবার অভিপ্রায়ে এরূপ লিখিয়াছেন। সে যাহা হৌক এখন নিয়ম মত চিঠি পত্র পাইলেই হয়।

তোমার বধূঠাকুরাণী কর্ম্মা, শুনিয়া সুখী হইলাম। লেখা পড়া জানেন কেমন? তাঁহার বাপ কি কাজ করেন? ভাই বোন্ কয়টি?

সোণা বধূর ও ছোট বধূর কয় মাস? ভগিনি! তুমি

যে তোমার সব জিনিষপত্র নিতে লিখিয়াছ, ঠাকুর ভাই কি আর এখানে আসিবেন না ? রাঙ্গা দাদাকে ঠাকুর ভাইর টাকার বিষয় বলিয়াছি। কিন্তু রাঙ্গা দাদার টাকা হইতে সাহেব ৩০৲ টাকা কাটিয়া নিয়াছে। সেই কারণে রাঙ্গাদাদা বড় মনক্ষুণ্ণ আছেন। তোমার অলঙ্কার আমি নিব। কিন্তু ঠাকুর ভাইর জিনিষ নিব কি ? ৺ পূজার কি হইল জানাইবা। কাঠাম দেওয়া হইয়াছে কি ?

আমার দেবরের ব্যারাম সারিয়াছে ; কিন্তু ভালরূপ আরোগ্য হয় নাই। আমার শ্বশুর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছেন। তোমার শরীরের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবা। ঔষধ পত্র ব্যবহার না করিলে, বোধ হয় সারিবে না। ছোড় দাদা এখন কিছু পায় কি ? শ্রীমতী বিনোদিনী এখন কোথায় ? চারু চিঠি পত্র লিখে কি ? আহা ! চারুর কথা মনে হইলে, বুক ফাটিয়া যায়। অভাগিনীর শেষ সম্বল কয়খানি অলঙ্কার, তাহাও ছোড় দাদার কল্যাণে গেল। আর যে কবে পাইবে, তাহা ভগবানই জানেন। শ্রীমতী দলীর বড় ব্যারাম হইয়াছিল। সে যে বাঁচিয়াছে, সে কেবল ভগবানের কৃপায়। সোণা বধূকে আমার ভালবাসা দিও। ধন

ভাই সর্ব্বদা বলিত, "আমার সন্তান হইবে না।" এখন কি বলে, শুনিতে পাইলে সুখী হইতাম। এখন বিদায়। ঠাকুর ভাইকে আমাদের পত্রের উত্তর দিতে বলিও। সর্ব্বদা তোমাদের কুশল চাই। অত্রস্থ কুশল। ইতি

তোমার কুসুম।

কুসুমের হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল এবং চিঠি পত্র অতি ত্রস্ত লিখিত। সামান্য চিঠি লিখিতে ও বর্ণাশুদ্ধি যায় নাই। যেথানে যে চিহ্ন আবশ্যক তাহাই সেথানে দিয়াছে। চিঠি নকল করিতে কোন স্থলে আমার ভুল হইতে পারে; কিন্তু তাহার চিঠিতে, কমা, সেমিকোলেন, সম্বোন্ধন, উদ্ধৃতচিহ্ন প্রভৃতি ঠিক দেওয়া আছে।

কুসুমের গৃহ সাজাইবার স্পৃহা অতি বলবতী ছিল। দেওয়ালে কোন স্থানে ছবি, কোন স্থানে স্বহস্ত-নির্ম্মিত বিবিধবর্ণের কাগজের ফুল, কোন স্থানে আয়না বসাইয়া রাখিত।

এ দেশে ঘাস ও খেজুর পাতা দ্বারা এক প্রকার ডালা প্রস্তুত হয়। কুসুম তাহা দেখিয়া নিজে এক খানা ডালা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এক দিবস তাহার প্রসূতিকে বলিল, 'মা! আমি এই ডালায় করিয়া মুড়ি খাব।'

আশ্বিন মাসে আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে; সে জন্য কুসুম তাহার প্রসূতির সহিত অনেক বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর জ্বর হইয়া প্রায় আটাইস দিন ছিল। কুসুমের বাড়ী যাওয়ার দুই এক দিন পূর্ব্বেও তিনি বসিতে পারেন নাই, তথাপি কুসুমকে আহার করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। কুসুম তাঁহাদের বাড়ী হইতে আসিবার সময় তাঁহার প্রথম কন্যা ইন্দুমতীকে

সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। ইন্দুমতীর প্রচলিত নাম কালজাম। কুসুম সেই রজনীতে কালজামের সহিত একত্র ভোজন করিয়া একত্র শয়ন করিল। তাহার পর দিবস কালজামের মাতা তাহাকে নিবার জন্য লোক পাঠাইল। জননীর অসুখ এইজন্য অনিচ্ছা সত্বেও কালজাম কিছু বেলা থাকিতে বাসায় গেল। ইন্দুমতীর বয়স দশ বৎসর এবং কুসুমের চৌদ্দবৎসর দুই মাস আঠার দিবস। ইন্দুমতী পরে আমাকে বলিয়াছে, "কুসুম বিদায় হইবার সময় আমাকে বলিল" 'ভাই! আর দেখা হবে কি না কে জানে?' আমি বলিলাম, "কেন ভাই? তুমি আসিলেই আবার দেখা হবে।" কুসুম বলিল, "মরণ বাঁচনের কথা কি ভাই বলা যায়?"

যবনিকা পতন।

কুসুম পূজার সময় কামারগাঁ অনেকের সঙ্গে দেখা করিবার বাসনায় তাহাদের নিকট পত্র লিখিয়াছিল। শৈবলিনীকে কুসুম বড়ই ভাল বাসিত। শৈবলিনীর স্বভাব অতি নিরীহ এবং পবিত্র। ইন্দুমতী ও শৈবলিনীকে কুসুম এক ভাবেই দেখিত। পূর্ণবাবু কুসুমকে রাজখাড়া নামাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। জলদা ও তাহার স্ত্রী, শৈবলিনী ও তাহার স্বামী, বিনোদিনী ও তাহার স্বামী, হেমাঙ্গিনী ও তাহার স্বামী, শশী ঘোষের কন্যা ও মহিম ঘোষের দৌহিত্রী প্রভৃতি অনেকে কুসুমকে দেখিবার জন্য কামারগাঁ উপস্থিত ছিল। কুসুম শ্বশুরের মনরক্ষার জন্য কামারগাঁ গেল না। কুসুমের মাতুল কুমুদিনী বাবু ও তাহার মাতুলানী এবং বিপিন কুসুমকে হাওড়াতে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহাদের সে বাসনাও পূর্ণ হয় নাই।

ঊনিশে আশ্বিন রবিবার বেলা নয়টার সময় আমি ও কুসুম বাড়ী

রওয়ানা হইলাম। দিনের বেলায় এখান হইতে যাত্রা করাতে সন্নিহিত পাহাড় সকল সুন্দর দৃশ্যমান হইল। কুসুম আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সকল কোন্ পাহাড়?" আমি বলিলাম "কেনারি ও সীতাগড় পাহাড়। এই দুই পাহাড়ই তুমি দেখিতে চাহিয়াছিলে।" উহাদের উপরে আমি উঠিতে পারিতাম না। এখান হইতে পাহাড় গুলি যত সুন্দর দেখায়, উহাদের উপরে উঠিলে তত সুন্দর দেখায় না, কিন্তু উচ্চতা হেতু নিম্নভূমি অতি মনোহর দেখায়। এইরূপে প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে আমরা ২২শে আশ্বিন বুধবার সপ্তমী পূজার দিবস বেলা আট ঘটিকার সময় জালালদি ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ণ বাবু দুইজন ভৃত্য ও একটি পরিচারিকা ষ্টেসনে রাখিয়াছিলেন। কুসুম আবিধারা গেল। আমি বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কামারগাঁ আমার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বাটীর অনেকেই কুসুমকে না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল এবং আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিল।

আমি বাটীতে কয়েক দিবস থাকিয়া বিজয়া দশমীর পর আবিধারা গেলাম। আমার জানুতে বেদনা হওয়াতে আমার তিন চারি দিবস তথায় থাকিতে হইল। পূর্ণবাবু কুসুমকে পূজার সময় একটা স্বর্ণাঙ্গুরী দিয়াছিলেন। কুসুম আমাকে তাহা দেখাইল এবং বলিল, "আমার শ্বশুর আমাকে খুব সুন্দর একখানা কাপড় দিয়াছেন।" আমি যে দিবস আবিধারা হইতে কলিকাতা যাই, সেই দিবস কুসুম স্বহস্তে মাংস পাক এবং সন্দেশ প্রস্তুত করিয়াছিল। পূর্ণবাবু এবং আমি এক স্থানে আহার করিতে বসিয়াছিলাম। কুসুম আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাংস কেমন হয়েছে?" আমি বলিলাম, "আমি ত তোমার পাক করা মাংস অনেক দিন খেয়েছি, তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা কর। পূর্ণবাবু বলিলেন, "বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে।" কুসুম আনন্দ বিস্ফারিত-

নয়নে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তাহার পর সন্দেশ আনিয়া বলিল, "এ সন্দেশ আমি তৈয়ের করেছি।" আমি বলিলাম, "কুসুম নানাপ্রকার মাংস, পোলাও, বাদসাহি লুচি, নিম্‌কি, সন্দেশ, রসগোল্লা, নারিকেলপুর প্রভৃতি অনেক জিনিষ প্রস্তুত করিতে শিখেছে।"

আমি কলিকাতা যাইয়া কুসুমের জন্য খুব বড় এবং সুন্দর একটি ষ্টিল ট্রঙ্ক ক্রয় করিলাম। কুসুমকে বিবাহে যে ট্রঙ্কটি দিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার কাপড় ধরিল না। এই জন্য কুসুম তাহার সঙ্গে কড্‌লিভার অয়েল, কুইনাইন এবং তাহার পুতুলটি নিতে পারে নাই। সে তাহার পুতুলটির জন্য নিজে ঘাগরা, টুপি ও মুজা তৈয়ার করিয়াছিল।

হাজারিবাগ পৌঁছিবার দুই দিবস পরেই আমার জ্বর হইল। কয়েক দিবস বেশী জ্বর ছিল। তাহার পর অল্প অল্প জ্বর অনেক দিন ছিল। কুসুম আমার জ্বরের সংবাদ পাইয়া বড়ই চিন্তায় রহিল। আমি সুস্থ হইয়া তাহাকে লিখিলাম, "আমার এখন জ্বর হয় না।"

১৫ই কার্ত্তিক কুসুম শৈবলিনীকে লিখিয়াছিল—

আবিধারা।
১৫ই কার্ত্তিক।

প্রিয়বরাসু—

প্রিয় দিদি!

তোমার পত্র পাইলাম। সর্ব্বদা এই প্রকার পত্রাদি লিখিও। তোমার সহিত দেখা না হওয়াতে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত আছি। কি করিব দিদি! সকলই ভগবানের ইচ্ছা। দিদি! আমি যে জ্যৈষ্ঠ মাসের আগে কামারগাঁ যাইতে পারি, এমন সম্ভব নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে

কয়েক দিনের জন্য যাইতে পারি। দিদি! তোমাদের যোগেশ বাবু ঢাকা গিয়াছেন। তাঁহার পত্রাদি পাই। ভালই আছেন। তোমার শাশুড়ী কেমন হইয়াছেন? আর অধিক কি লিখিব। বাবা আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বোধ হয় ভালই আছেন। দাদার পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা সকলেই ভাল আছেন। আমার ননদের আজ ৬ দিন হয় একটি মেয়ে হইয়াছে। তাহারা ভাল আছে। আমার শরীর বড় ভাল নয়। সদা সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল চাই। ইতি।

তোমার স্নেহের বোন কুসুম।

১৫ কার্ত্তিক কুসুম হাজারিবাগে নিম্নলিখিত চিঠিগুলি লিখিয়াছিল।

আবিধারা।
১৫ই কার্ত্তিক।
শনিবার।

শ্রীচরণ কমলেষু—

পূজনীয়া মামীমা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি এখানে আসার পর আর আপনার কাছে চিঠি পত্র লিখি নাই; তজ্জন্য আমি যার পর নাই লজ্জিতা আছি। এখানে আসার পর সর্ব্বদা আপনাদের কথা মনে হয়। কিছুই ভাল লাগে না। কারো কাছে চিঠি পত্র লিখ্‌তেও ইচ্ছা হয় না। মামী

মা! আমি আপনার স্নেহ কখনও ভুলিতে পারিব না। আর কত দিন পর যে আপনাদের দেখ্‌তে পাব তা জানি না। বেঁচে থাক্‌লে অবশ্যই দেখা হবে। আপনি এখন ভাল হ'য়ে হাঁট্‌তে পারেন ত? আপনার জন্য বড় চিন্তায় আছি। শান্তি কি কলিকাতায় গিয়াছে? তাহার মাতাকে আমার প্রণাম দিবেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য কালজামকে পাঠিয়ে দিবেন। আপনি যখন ভাল হ'বেন, তখন আপনিও যাবেন। আজ ৬ দিন হয়, আমার ননদ সরোজিনীর একটি মেয়ে হ'য়েছে। তারা মায়ে ঝিয়ে ভালই আছে। আর বেশী কি লিখিব। মামা বাবুকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম দিবেন। আমরা ভাল আছি। আগতে শ্রীচরণ কুশল সহ বাসার সকলের কুশল প্রার্থনীয়। ইতি।

আপনার স্নেহের কুসুম।
আবিধারা।
১৫ই কার্ত্তিক।
শনিবার।

শ্রীমতী শান্তিসুধা দাসী—
সমীপেষু—

প্রিয় শান্তি! আমি এখানে এসে তোমাদের কাছে

চিঠিপত্র লিখি নাই বলে, তোমরা হয়তো আমার উপর রাগ করেছ। কিন্তু ভাই! আমার যেন এখানে এসে কারো কাছে চিঠি লিখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। মনটা যেন কেমন উদাস২ বোধ হয়। তোমরা সর্ব্বদা আমার কাছে চিঠি দিও। আমার ঠিকানা লিখে দিলাম, এই ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌বে। তোমার মাকে আমার প্রণাম দাও, তুমি আমার ভাল বাসা লও ও মৈত্রেয়ীকে দাও। আমি ভাল আছি, সর্ব্বদা তোমাদের কুশল চাই। ইতি।

তোমাদের স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী কুসুম।

ঠিকানা—

পোঃ রাজখাড়া, গ্রাম আবিধারা, শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ী। ঢাকা।

আবিধারা।
১৫ই কার্ত্তিক।

স্নেহাস্পদাসু—

প্রিয় কালোজাম! আমি আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম, "যেয়েই তোমাদের কাছে চিঠি লিখ্‌ব"। কিন্তু আমি তা লিখি নাই; সে জন্য রাগ ক'রোনা। পূজার ক দিন কাজ কর্ম্মের গোলমালে কারো কাছে

চিঠি লিখি নাই। তারপর এখানে আসার পর মনটা যেন বড় খারাপ বোধ হয়, কারো কাছে চিঠি পত্র লিখ্‌তে ইচ্ছা হয় না; মার কাছেও এসে অবধি মাত্র একখানা কার্ড লিখেছি।

আজ ৬ ছয় দিন হয়, আমার ননদের একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়েটি দেখ্‌তে বেশ হয়েছে। মেয়ে আর মেয়ের মা, তুজনেই ভাল আছে। চিঠি খানা পাওয়া মাত্র উত্তর দিও। শান্তিকে আমার ভালবাসা দিও। খোক্‌না, বুড়, মণ্টু ও মৈত্রেয়ীকে আমার স্নেহাশীষ দিও। তুমি আমার ভালবাসা লও। মামীমা এখন কেমন আছেন? আমি মার কাছে তোমাদের সংবাদ জান্‌তে চেয়েছি। কিন্তু মা তার উত্তর দেন নাই। কালোজাম! কতদিনে আবার তোমাদের দেখ্‌তে পাব, কে জানে? এখন তোমাদের বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। যদি সকলে প্রাণে২ বাঁচিয়া থাকে, তবে আবার দেখা হবে, নইলে তো সেই শেষ দেখা। আর বেশী কি লিখ্‌ব। আমার শরীর এক রকম আছে। বড় তাড়া-তাড়ি, তোমরা ভাল আছ ত? এখন তবে বিদায়। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি।

তোমার ভালবাসার কুসুম দিদি।

কার্ত্তিক মাসে কুসুমের জ্বর হইল। আমি জলদার নিকট পাঁচ টাকা পাঠাইয়া লিখিলাম, তুমি আবিধারা যাইয়া কুসুমকে দেখিবা এবং আবশ্যক হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবা। জলদা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র ও একজন প্রতিবাসী· হরিচরণ দেকে পাঠাইয়াছিল। কুসুমের জ্বর তখন সারিয়াছিল। জ্ঞানেন্দ্র কুসুমকে বলিয়াছিল, "এত আদরের মেয়ে, বাপ পেন্‌সন্ নিয়া মেয়ের কাছে থাক্‌লেই পারে।" কুসুম তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া আমাকে লিখিল, "আমার অসুখ হইলে আমিই আপনাকে লিখিব। আপনি ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইবেন না।" আমি পূর্ণ বাবুকে লিখিলাম, কুসুম এখানে থাকিতে কড্‌লিভার অয়েল এবং মধ্যে২ কুইনাইন সেবন করিত। তিনি লিখিলেন, "সর্ব্বদা ঔষধ ব্যবহার করা কি ভাল?"

৮ই অগ্রহায়ণ পরের লিখিত চিঠি দুইখানা কুসুম হাজারিবাগ পাঠাইয়াছিল।

আবিধারা।
৮ই অগ্রহায়ণ।

মান্যবরাসু—

মাননীয়া মামী মা! আজ সাত আট দিন হয় আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানা পাইয়াছি, আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী কুসুমকে স্মরণ করিয়া মধ্যে২ পত্র লিখিবেন। শান্তি কলিকাতা কাহার নিকট আছে, জানাইবেন। কালোজামকে সর্ব্বদা পত্র লিখিতে বলিবেন। আপনি ব্যারাম থেকে উঠেই স্কুলের কাজ আরম্ভ ক'রে ভাল করেন নাই, আরো কিছু দিন গেলে পর বোধ হয় ভাল

হইত। বাবার অসুখ সেরেছে, শুনে নিশ্চিন্ত হ'লেম। আপনার দোকানে কি বাপ্তা আসে নাই? বাপ্তার বড়ির কথা বাবা আমাকে লিখেছেন যে, "তোমার বাপ্তার বড়ির ইচ্ছা থাকিলে লিখিও"। মামী মা! আমার জ্বর হয়েছিল, ৫ দিন ছিল; তারপর সেরে গেছে। এখন একরূপ ভালই আছি। যদি আপনি ঝিলের দিকে বেড়াতে আসেন, তবে যেন বাবার সঙ্গে ও মার সঙ্গে দেখা ক'রে যান। তাঁরা আপনাকে দেখ্‌লে বড় আহ্লাদিত হন্। আমার ননদ ভাল আছে। শ্বশ্রু মাতা ঠাকুরাণী ভাল আছেন, আপনার পত্রের কথা তাঁকে জানিয়েছি। শান্তির মার—পরিবর্ত্তে এখন স্কুলে কে কাজ করেন? আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। কালোজামদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে কিনা লিখিবেন। যদি বাহির হইয়া থাকে, তবে শান্তি ও কালোজাম পাস হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য ইচ্ছুক রহিলাম। খোক্‌না, বুড় ও মণ্টু কেমন আছে? মামা বাবুকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবেন ও আপনি লইবেন। আমরা ভাল আছি আগতে আপনাদের কুশল চাই। ইতি।

আপনার স্নেহের কুসুম।

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের কালোজাম ! তোমার চিঠি পেয়েছি, সর্ব্বদা এইরূপ চিঠি লিখিও। শান্তি যে কলিকাতায়, তা আমি জানি না। সে কার কাছে আছে ? তার মা কিশোরগঞ্জে গেছেন, তবে তাঁর পরিবর্ত্তে কে কাজ করে*? তুমি পরীক্ষায় পাস হয়েছ ত ? বিহারী বাবুর মেয়েরা কে কে এখানে আছে, যদি জান, তবে লিখো। আমার শরীর এখন ভাল আছে; কিন্তু জ্বর হয়েছিল। তোমরা সর্ব্বদা চিঠি লিখো, খোক্না, মণ্টু ও বুড় কেমন আছে ? তুমি আমার ভালবাসা নেও। মামী মা, তুমি, মামাবাবু ও সারদা দিদি কেমন আছ ও আছেন লিখ্‌বে। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা--তোমার কুসুম দিদি।

* অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ণবাবু লিখিলেন, "কুসুমের শরীর ভার ভার বোধ হয়, তাহার বেতো শরীর।" কুসুম আমার নিকট থাকিতে রাত্রিতে প্রায়ই লুচি কিম্বা রুটি আহার করিত। আমি পূর্ণবাবুকে লিখিলাম, "কুসুমকে রাত্রিতে রুটি আহার করিতে দিবেন।" পূর্ণবাবু তাহার উত্তরে লিখিলেন, কুসুমকে জিজ্ঞাসা করাতে সে রুটি খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল।

অগ্রহায়ণ মাসে জলদা কুসুমকে কামারগাঁ নিবার প্রস্তাব করিল। কুসুম তখন কামারগাঁ যাইতে স্বীকার পাইল না। তাহার পর বৈবাহিকা মহাশয়া কুসুমের গর্ব্ভসঞ্চারের সংবাদ লিখেন। এই সংবাদ শ্রবণে

কুসুমের প্রসূতির হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। সে আমাকে বলিল, "গত সন কুসুমের এই ভয়ানক অবস্থা গিয়াছে। এখনও শরীর ভাল করিয়া সারে নাই ; এবার আর কুসুমের প্রাণের আশা নাই।"

২০শে অগ্রহায়ণ কুসুম জলদার স্ত্রীকে লিখিয়াছিল।

শ্রীহরিসহায়।

আবিধারা।

২০শে অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সরোজ ! এইমাত্র তোমার মধুমাখা লিপিকা প্রাপ্তে অপরিসীম সুখী হইলাম। সর্ব্বদা এই প্রকার পত্রাদি লিখিবা।

তোমাদের যোগেশবাবু ভাগলপুর গিয়াছেন। তাঁহার পৌঁছ সংবাদ আসিয়াছে। আমি পোষ্ট কার্ডে বলিয়া সে সব খবর লিখি নাই। তোমার পূর্ব্বের পত্র আমি যে দিন কার্ড লিখিয়াছি, সেই দিনই পাইয়াছি। আমার চিঠিখানা বোধ হয় দুই দিন ঘরে ছিল। কিন্তু তোমার এই চিঠিখানা কত দিন ঘরে ছিল ? ঠাকুর ভাই কলিকাতা গিয়াছেন কি ? তাঁহার শরীর কেমন ?

হারাণীকে তুমি আমার হইয়া একটি চুম্বন দিও। কত দিনে তাহাকে দেখিব কে জানে ?

শ্রীমান্ কুটকুটের ব্যারামের বিষয় শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত রহিলাম। তাহার সংবাদ জানিয়া থাকিলে,

তুমি সত্বর আমাকে লিখিবা। চিঠির উত্তর কি কারণে দেরীতে দিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। বোধ হয় কোন কারণ ছিল না। কয়েক দিন যাবৎ ডান হাতের বুড় আঙ্গুলটাতে বড় বেদনা হইয়াছে। বোধ হয় পাকিবে।

তোমাদের যোগেশবাবু বলিয়াছিলেন যে, "বড় বৌ ঠাকরুণের কাছে শীঘ্রই চিঠি লিখিব।" লিখিয়াছেন কি না জানি না।

সরোজ! ভগিনি! এ জীবনে বোধ হয় আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। এ অতৃপ্ত আশার তৃপ্তি সাধন কবে হইবে, ভগবান্ জানেন। শরীর বড় ভাল নয়; যেন দিন দিন দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। কাহাকেও জানাইও না।

আমাকে নিতে আসিলে এখন দিবে না। যখন সময় হয়, তখন আমিই জানাইব। আমার ননদের মাঝে মাঝে "হিষ্টিরিয়া" হয়। মেয়েটিরও অসুখ। তোমার শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবা। মাখনের মাতাকে আমার ভালবাসা দিও। সতীন্দ্র দাদার বিবাহের কথা লিখিয়া আবার কাটিয়া দিয়াছ কেন? বিস্তারিত করিয়া জানাইও। বিবাহ কে দিতেছে? সম্বন্ধ কোথায় আসিয়াছে? আর অধিক কি লিখিব। সর্ব্বদা

তোমাদের কুশল লিখিবা। আমাদের এখানে একরূপ মঙ্গল। বাবার পত্র অনেক দিন হয় পাই না। সে কারণ চিন্তায় আছি। ঠাকুর ভাইর ঠিকানা কি? ইতি।

তোমার স্নেহের ভগিনী কুসুম।

৫ই পৌষ কুসুম জলদার স্ত্রীকে লিখিয়াছিল—

প্রাণের সরোজ!

আজ ৫ দিন হয় তোমার মধুমাখা লিপিখানা পাইয়াছি। সর্ব্বদা এইরূপ পত্র লিখিয়া তোমার কুসুমকে সুখী করিতে অন্যথা করিও না। তোমার চিঠিখানা ঘরে না থাকিলেও আমি দেরীতে পাইয়াছিলাম।

ঠাকুর ভাইর গত মাসে যাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া লিখিয়াছিলে। সেই জন্য আমি তাঁহার পত্রের উত্তর দিলাম না। এ বিষয় তাঁহাকে জানাইও।

বাবার ও মার পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা ভাল আছেন। আমি বোধ হয় মাঘ মাসে হাজারিবাগ যাইব।

আমার আঙ্গুল পাকিয়া মুখ বাহির হইয়া সারিয়া গিয়াছে। চিন্তা করিবা না। আমার শারীরিক সংবাদ * আমি সর্ব্বদা তোমাকে জানাই। হারাণীকে

বোধ হয় আমি জীবনে নাও দেখিতে পারি। কেননা আমার কোন আশাই সফল হয় না। আমার ননদ ভাল আছে। কিন্তু শিশুটি বাঁচে কিনা সন্দেহ। সমস্ত গায়(......)...ঘা হইয়াছে এবং নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

তোমাদের যোগেশ বাবু ভাল আছেন। সতীন্দ্র দাদার বিবাহ সম্বন্ধ কোথায় আসিয়াছিল? আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। আমার শরীর বড় খারাপ। যেন দুর্ব্বল বোধ হয়। সর্ব্বদা তোমাদের কুশল চাই। ইতি।

তোমার কুসুম।

৫ই পৌষ কুসুম শৈবলিনীকে লিখিয়াছিল।

আবিধারা।
৫ই পৌষ।

প্রিয় দিদি!

অদ্য ৪।৫ দিন হয় তোমাদের উভয়ের পত্র পাইয়াছি। সর্ব্বদা এইরূপ পত্রাদি লিখিও। চিনি খুড়ীমার ঔষজ পড়ার সময় তুমি না থাকিলে চলিবে না সুতরাং তাঁহার উচিত যে, তোমার শাশুড়ীর নিকট এবিষয়

বিনয় করিয়া লিখেন। দিদি! আর আমাদের দেখা বোধ হয় কোন দিনই হইবে না। আমি বোধ হয় মাঘ মাসে হাজারিবাগ যাইব। পচির মেয়ে হইয়াছে। ধনবধূর ছেলে হইয়াছে। তোমাদের যোগেশবাবু ভাল আছেন। তাঁহার চিঠি তোমাকে দেখাইব; কিন্তু এখন দিলে ভারি হইবে। হাজারিবাগ গিয়া পাঠাইয়া দিব। তুমিও সতীশ বাবুর একখানা চিঠি আমাকে দেখাইও। অধিক কি লিখিব। আমার শরীর বড় খারাপ তোমাদের মঙ্গল চাই। ইতি

তোমার স্নেহের কুসুম।

বীরতারার ঠিকানা।

পোঃ কোলা, বীরতারা গ্রামে নাজিরের বাড়ী। ঢাকা।

পৌষ মাসের প্রথম ভাগেই কুসুম লিখিল, "আমার শরীর ভাল নয়।" তাহার কয়েক দিন পরেই পূর্ণবাবু সংবাদ দিলেন—"কুসুমের সামান্য জ্বর, প্লোদর ও কোমর বেদনা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ শুভ বলিয়া বোধ হয় না। কবিরাজি মতে চিকিৎসা করিতেছি।" কুসুম লিখিল, "আমার জ্বর বৈকাল বেলা একশত ডিগ্রীর উপর হয়। কবিরাজ বলিয়াছে, ভাত সহ্য হইবে; স্নান সহ্য হইবে না।" আমি এখানে কোন ডাক্তারকে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের স্কুলের কয়েক জন শিক্ষককে সমস্ত বিবরণ জানাইলাম। তাঁহারা বলিলেন, গর্ভাবস্থায় এরূপ জ্বর হয়। কবিরাজি ঔষধে সারিয়া যায়। ১২ই পৌষ কুসুম লিখিল, "আমার জ্বর বৈকাল বেলা ১০৩ কিম্বা তাহার উপর হয়।

আমাকে সত্বর এখান হইতে নিবেন। পৌষ মাস হইয়াই অসুবিধা হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রথম ভাগেই আমাকে নিবেন। ৭ই, ৮ই মাঘের ঐদিকে যেন না যায়।" পূর্ণবাবুর পত্রও সেই দিন পাইলাম— "আমি ভারি অশান্তিতে আছি। কুসুমকে পাচন ইত্যাদি দিয়াছি। কোন ফল পাইতেছি না। সরোজিনীর কন্যাটি বোধ হয় বাঁচিবে না। আমার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদ এখন পর্য্যন্ত আমার পরিবারকে শুনাই নাই। পাচিকাটি বিদায় নিয়াছে। খানসামা দুইজনের জ্বর। টাকা দিয়াও চাকর পাইতেছি না। ভগবান আমাকে বড়ই অশান্তিতে রাখিয়াছেন।" আমি ১৬ই পৌষ এই পত্র পাইয়াছিলাম। আমি সেই দিবসই হারণ্ সাহেবের নিকট যাইয়া সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি কুসুমের রোগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন নাই, তথাপি এমন ভাবে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিলেন যে, যদি তাহার গর্ভধারণ করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্রাব হইবে না। আর যদি গর্ভধারণ করিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তান পতিত হইবে।

ডাকে ঔষধ পাঠাইলে পার্সেল আবিধারায় অনেক বিলম্বে পৌঁছিবে এবং ঔষধের শিশি ভাঙ্গিয়াও যাইতে পারে; এইজন্য হারণ্ সাহেবের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ ১৬ই পৌষ জলদার নামে কামারগাঁয়ে পাঠাইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, জলদা ১৯শা পৌষ প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ পাইবে, এবং ১৯শা কিম্বা ২০শা পৌষ ঔষধ নিয়া আবিধারা যাইবে। কিন্তু জলদা যে হঠাৎ কলিকাতা গিয়াছিল, তাহা আমি জানিতাম না। আমি কুসুমকে ১৬ই পৌষ লিখিলাম, তোমার জন্য হারণ্ সাহেবের ব্যবস্থাপত্র জলদার নিকট পাঠাইলাম। সে তোমার ঔষধ ভাগ্যকুল হইতে নিয়া যাবে। তুমি সকাল বেলা পাঁচ গ্রেইন এবং বিকাল বেলা পাঁচ গ্রেইন কুইনাইন খাইবা। ভাত কখনও খাইবা না। নাপিত কবিরাজের ব্যবস্থামত ভাত

খাওয়াতে তোমার জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে। হারণ্ সাহেব তোমাকে সকাল বেলা দুগ্ধরুটি এবং রাত্রিতে দুগ্ধবার্লি কিম্বা দুগ্ধসাগু আহার করিতে বলিয়াছেন। তিনি জ্বর থাকিতে তোমাকে এখানে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। জ্বর সারিয়া গেলে, এখানে আনিতে বলিয়াছেন। এই ঔষধ পাঠাইলাম। যদি ইহাতে জ্বর সারিয়া যায়, তবে ৪ঠা মাঘ তোমাকে এখানে আনিব।

কুসুম এক পত্রে লিখিয়াছিল, "শ্বশুর মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিলাম, আপনার জ্বর হয়, তাই ভাবি, আমাকে হাজারিবাগে নিয়া যাবে কে ?" তদুত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম, "আমার অসুখ সারিয়াছে ; কিন্তু যদি যাতায়াতের দরুণ পুনরায় জ্বর হয়, এই জন্য দ্বিজেন্দ্রকে বাড়ী পাঠাইব। দ্বিজেন্দ্র এবং লোহা এক গাড়ীতে থাকিবে এবং তুমি ও দ্বিজেন্দ্রের স্ত্রী অন্য এক গাড়ীতে থাকিবে। হারণ্ সাহেব যখন জ্বর সত্ত্বে তোমাকে এখানে আনিতে নিষেধ করেন, তখন আমি ২৬শা পৌষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। যদি ২৬শা পৌষের মধ্যে তোমার জ্বর সারিয়া যায়, তবে তোমাকে এখানে আনিতে দ্বিজেন্দ্রকে বাড়ী পাঠাইব। নচেৎ ২৭শা পৌষ দ্বিজেন্দ্র এবং তোমার প্রসূতিকে বাড়ী পাঠাইব। ৩০শা পৌষ তাহারা রাজখাড়া পৌছিবে এবং তথা হইতে তোমার জন্য পাওয়া-রুটি, বিস্কুট ও বেদানা পাঠাইবে। ১লা মাঘ অশ্লেষা, ২রা মাঘ মঘা, ৩রা মাঘ তোমাকে আনিতে দ্বিজেন্দ্র যাইবে, ৪ঠা মাঘ সে তোমাকে নিয়া কামারগাঁ যাবে।

পূর্ণবাবু এবং কুসুম ঔষধের জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলেন। ১৬ই পৌষ হইতে ২২শা পৌষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন পত্র না পাইয়া আমরা কুসুমের জীবন সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলাম। ২৩শা পৌষ কুসুমের পত্র পাইলাম—"যখন ভাত খাইতাম, তখন আমার জ্বর ১০৩°। ১০৩॥ ডিগ্রী

হইত। ভাত বন্ধ করাতে ১০২° জ্বর হয়। কুইনাইন খাওয়াতে জ্বরের বিশেষ কিছুই হইতেছে না। আমার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে। ঠাকুর ভাই ঔষধ নিয়া এখনও আইসেন নাই—।”

ইতি মধ্যে জলদার চিঠি পাইলাম—“আমি হঠাৎ কলিকাতা আসিয়াছি, এজন্য আপনার নিকট পূর্ব্বে পত্র লিখিতে পারি নাই।” আমি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে লিখিলাম,—“কুসুমের জন্য হারণ্ সাহেবের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ তোমার নামে কামারগাঁয়ে পাঠাইয়াছি। তুমি বাড়ীতে লিখিয়া দেও, জ্ঞানেন্দ্র কিম্বা অন্য কেহ শীঘ্র কুসুমের ঔষধ নিয়া আবিধারা যায়। জলদা জ্ঞানেন্দ্রকে ঔষধ নিয়া যাওয়ার জন্য বাটীতে চিঠি লিখিল। জ্ঞানেন্দ্র বাড়ী ছিল না, সে মাণিকগঞ্জ গিয়াছিল। সে বাটীতে আসিয়া দীনবন্ধু দত্তকে ঔষধ সহ ২৭শা পৌষ আবিধারায় পাঠাইয়াছিল।

২৫শে পৌষ কুসুম আমাকে লিখিয়াছিল—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু=

বাবা! আপনার দুই খানা পত্র গত কল্য একত্র পাইলাম। একখানা ১৬ই তারিখের ও একখানা ১৭ই তারিখের। আমি প্রত্যহ ১০ গ্রেইন করিয়া কুইনাইন খাইতাম; কিন্তু হারণ্ সাহেবের ব্যবস্থামত এক শত ডিগ্রীর বেশী জ্বর হইলে, কুইনাইন খাওয়া নিষেধ। আমার জ্বর ৮।৯টার সময়তেই ১০০ হয়। সমস্ত দিনে জ্বর একবারও ছাড়ে না। খুব প্রাতে ৯৯॥ থাকে, তাহার পর ১০০, আবার কিছুক্ষণ পর ১০১। বৈকালে এখন ১০২ হয়। ভাত খাইয়া ১০৩, ১০৩॥

হইত। কুইনাইন দিনে একবার পড়ে। আমার জন্য কামারগাঁ হইতে জ্বরের ঔষধ আনে নাই। কবে যে আনিবে, ঈশ্বর জানেন। ... ... ১৬ই পৌষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। ১৯শে তারিখে অবশ্য পাইয়াছে। ২০শে তারিখে ঔষধ লইয়া ২১শে কি ২২শে তারিখে নিশ্চয়ই আসিতে পারিত। আজপর্য্যন্ত যখন আসিল না, তখন তাহার আশা সম্বন্ধে আমি নিরাশ হইয়াছি।

... ...মাতাঠাকুরাণী বাটী রওয়ানা হইয়াছেন কি না জানি না। এই জন্য তাঁহার নিকট আর পৃথক্ পত্র লিখিলাম না। ইতি

সেবিকা—কুসুম।

২৬শে পৌষ কুসুম পূর্ণবাবুর চিঠির সঙ্গে পরবর্ত্তী চিঠি দিয়াছিল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতৃদেব মহাশয়ের
শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

গত কল্য আপনার নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছি। বোধ হয় এই পত্র আর পূর্ব্ব পত্র এক সঙ্গে পাইবেন। আমার, জ্বর এখন বৈকাল বেলা ১০২ হয়, রাত্রিতে খুব মাথা ধরে এবং শীত বোধ হয়, সে সময়তে জ্বর আরোও বাড়ে কিনা বলিতে পারি না। কেননা তখন

আর নিজে উঠিয়া দেখিতে পারি না। কোমরে বেদনা আছে। আর পূর্ব্বে যে যে অসুখ ছিল, তাহাও আছে। গত পরশ্ব কিছু রক্তস্রাব হইয়াছিল। সেই দিনই কি ঔষধ দেওয়াতে বন্ধ হইয়া যায়। কুইনাইন খাওয়াতে জ্বরের বিশেষ কোনই উপকার বুঝি না। দিনে কি রাত্রে একবারও জ্বর ছাড়ে না। খুব ভোরে ৯৯॥ থাকে, তাহার পর ১০০ হয়, আবার অল্পক্ষণ পরই ১০১ হয়। ইহার পর ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। পিঠে বেদনা আছে। শরীর আজ কাল অত্যন্ত দুর্ব্বল। কাশীও খুব হইয়াছে। কফের সঙ্গে সময় সময় রক্ত পড়ে। বোধ হয় সেটা ক্রুর কফের দোষ। কাশীতে কাশীতে বুকে একটু বেদনা হইয়াছে।

হজম শক্তি একেবারে নাই। যাহা খাই, বাহ্য বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। বাহ্যির রং শাদা; কিছু পাতলা রকমের হয়। দিনে কোন দিন এক বার যাই, কোন দিন দুই বার যাই। বৈকালে যাহা খাই, তাহাই বমি হয়। আপনি যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ ঠাকুর ভাইর নিকট পাঠাইয়াছেন, তিনি আজ পর্য্যন্তও আসিলেন না। আর অধিক কি লিখিব। এখানকার প্রাণগতিক মঙ্গল; সর্ব্বদা আপনাদের মঙ্গল চাই। ইতি।

কুসুমের ২৫শা পৌষের পত্র এবং পূর্ণবাবুর ২৬শা পৌষের পত্রের সঙ্গে কুসুমের ২৬শা পৌষের পত্র একত্র ২৯শা পৌষ পাইয়াছিলাম। পূর্ণবাবু লিখিয়াছিলেন,—"কুসুমের ব্যারামের বিস্তারিত বিবরণ তাহার পত্রে অবগত হইবেন। সে দিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আমি কুসুমের জন্য ভারি অশান্তিতে আছি।" রাত্রিতে চিঠি পাইয়া তাহার পর দিবস প্রাতে আমি হারণ্ সাহেবকে কুসুমের পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া সকল রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ খানা কুসুমের নামে কামারগাঁয়ে পাঠাইয়া দিলাম। চিঠিতে লিখিলাম, এই ঔষধ সেবন করিলে তোমার বুকের কফ, পিঠের বেদনা, বুকের বেদনা ও জ্বর সারিবে, হজমশক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং বাহের রং ভাল হইবে। যদি কোন কারণে কুসুম ৪ঠা মাঘ কামারগাঁ না যাইতে পারে, এই সন্দেহ করিয়া আবিধারার ঠিকানায় কুসুমের ও পূর্ণবাবুর নিকট ঐ মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলাম। এবং হারণ্ সাহেবের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ যে কামারগাঁয়ে পাঠাইলাম, সে সংবাদও দিয়াছিলাম। কুসুম গর্ব্ভাবস্থায় রক্তস্রাবের বিষয় লিখিয়াছিল। এই জন্য লিখিয়াছিলাম,—"যদি গর্ব্ভাবস্থায় রক্তস্রাব হয়, তবে হারণ্ সাহেবের হেমিমেলিস নামক যে ঔষধের ব্যবস্থা পত্র আমি পূজার পূর্ব্বে তোমাকে দিয়াছি, সেই ঔষধ ডাক্তার খানা হইতে নিয়া সেবন করিবা।

২৩শে পৌষ কুসুমের চিঠি পাইয়া তাহার প্রসূতিকে ২৭শা তারিখে বাড়ী পাঠান সুস্থির করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে আমি কুসুমের প্রসূতিকে আবিধারা যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। লোকে নিন্দা করে বলিয়া সে তখন আবিধারা যাইতে স্বীকার পায় নাই। ২৭শে পৌষ কুসুমের জন্য পাঁওয়ারুটি ও বিস্কুট কিনিয়া দিলাম। দ্বিজেন্দ্রকে বলিয়া

দিলাম, "তুমি নৈহাটি হইতে কুসুমের জন্য বেদানা কিনিয়া নিও।" " Coming events cast their shadows before." আমি কুসুমের জন্য পরিবার বাটী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম ; কিন্তু আমার মন যেন কেমন কেমন করিতেছিল। কুসুম যেন আর বাঁচিবে না, আমার মনে এই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আমার পরিবারকে বলিয়া দিলাম—"শ্যামাচরণ এবং রাজমোহন দুই ডাক্তারকেই ডাকাইবা। তাহারা দুইজনে কুসুমকে দেখিয়া যে ঔষধ ব্যবস্থা করে, সেই ঔষধ শ্যামাচরণকে দিতে বলিবা। শ্যামাচরণ প্রত্যহ আসিয়া দেখিবে। রাজমোহনকে মধ্যে মধ্যে ডাকিবা। জালালদি ষ্টেসন হইতে চারি আনা পয়সা দিয়া কুসুমের রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি আবিধারা পাঠাইয়া দিবা। কুসুমের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য এক জন চাকরাণী এখান হইতে পাঠাইয়াছিলাম। রাত্রি আট ঘটিকার সময় আমার পরিবার এখান হইতে যাত্রা করিল এবং আমাকে বলিল, "বোধ হয় আমার আবিধারাও যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "কুসুমের যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তুমি বিচলিত হইও না। এখানে চলিয়া আসিও। পাওয়ারুটি বিস্কুট গুলি বিতরণ করিয়া দিও।"

নৈহাটিতে বেদানা কিনিবার সময় দ্বিজেন্দ্র পাইল না। ৩০শে পৌষ বেলা ১১টার সময় জালালদি ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দ্বিজেন্দ্র একটি লোক দ্বারা পাওয়ারুটি ইত্যাদি আবিধারায় পাঠাইয়া দিল। কুসুমের প্রসূতি ৩০শে পৌষ বাটীতে পৌঁছিয়া গৃহাদি সমস্ত পরিষ্কার করাইল। ৩রা মাঘ দ্বিজেন্দ্র আবিধারা গেল। ৪ঠা মাঘ কুসুমের প্রসূতি কুসুমের আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিল। জাহাজের সময় হইল। কুসুম আসে না, তখন সে নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইল। এমন সময় আমাদের একটি প্রতিবাসী প্রসন্ন ঘোষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"সোণাবধূঠাকুরাণি! কুসুমদের বাড়ীর দেওয়াঞ্জি মহাশয় আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া তাহার শরীর কম্পিত হইল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কুসুম কোথায়?" কুসুমদের দেওয়াঞ্জি তারকচন্দ্র বসু উত্তর করিল, "তাঁহার রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছে। কোমরে বেদনা, পেটে বেদনা, ও জ্বর; এই জন্য তিনি আসিতে পারিলেন না। আপনাকে নিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনি ব্যস্ত হইবেন না।" এই কথা বলিবার সময় তারকবসুর মুখ কালিমাময় হইয়াছিল।

কুসুম কামারগাঁয়ে পৌঁছিয়াছে, ভাবিয়া কুসুমের মাসীমাতা বিন্দু-বাসিনী, রাড়ীখাল হইতে তাহার স্বামী রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং পুত্র ভোলানাথকে কামারগাঁয়ে পাঠাইয়াছিল। গত সন রক্তস্রাব হইয়া কুসুম মরণাপন্ন হইয়াছিল। এই জন্য কুসুমের জননী দিশাহারা হইয়া রাজেন্দ্র বসুর নিকট আমার ৩০শে পৌষের চিঠি ও হারণ্ সাহেবের প্রেস্‌-ক্রিপ্‌সন্ দিয়া বলিল, "রক্তবন্ধের ঔষধ নিয়া আসুন।" রাজেন্দ্র বসু পূর্ব্বে ডাক্তারি করিত। সে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ নিয়া আসিল। কুসুমের গর্ব্ভধারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "রক্তবন্ধের ঔষধ এনেছেন?" রাজেন্দ্র ডাক্তার দুই শিশি ঔষধ, আমার সেই পত্র ও হারণ্ সাহেবের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ আমার পরিবারের হস্তে দিয়া বলিল, "ইহাতে যাহা আছে, তাহাই দিয়াছে।"

কুয়াশার জন্য জাহাজ গোয়ালন্দ হইতে ঠিক সময়ে কামারগাঁয়ে পৌঁছিতে পারে নাই। সেই জন্য কুসুমের জননী ৪ঠা মাঘ আবিধারা যাইবার জাহাজ পাইল না। তৎপর দিবস সকাল বেলা সে বলিল, "আমি শ্যামাচরণ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া নিব।" তারক বসু বলিল, "আমরা পাসকরা ডাক্তার আনিয়াছি। কেন এখান হইতে ডাক্তার নিবেন?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল, "সেই পাসকরা ডাক্তার হইতে এই পাসকরা ডাক্তার ভাল।" তারকবসু বলিল, "আমরাও পাসকরা ডাক্তারই এনেছি।"

কুসুম শ্বশুর শাশুড়ীর সন্তোষার্থে অসুস্থাবস্থায়ও অনেক গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিত। যে সময় তাহার ১০৩°। ১০৩॥ ডিগ্রি জ্বর হইত, তখনও সকাল বেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া শ্বশুরের জন্য চা প্রস্তুত করিত, গৃহপরিষ্কার করিত, দুগ্ধ গরম করিত, নিজের পরিধান বসন ধৌত করিত, নিজে একটুকু জল আনিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিত, শ্বশুরের আহারের সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত, তাঁহার আহার হইলে আহারের থালাখানা পাকগৃহে রাখিত, (যখন সুস্থ শরীরে ছিল তখন শ্বশুরের ভোজনাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি নিজে আহার করিত এবং শ্বশুরও সুখাদ্য আহারীয়ের অনেক অংশ তাহার জন্য রাখিয়া দিতেন), শাশুড়ীর আহারের স্থান করিত। তাঁহার আহার হইলে প্রথম কতক দিবস অন্ন এবং অন্নবন্ধের চিঠি পাওয়ার পর দুগ্ধরুটি আহার করিত। বৈকাল বেলা গৃহপরিষ্কার করিত, শয্যা করিত, তাহার পর সরলতার নিকট বসিয়া থার্ম্মমিটার দ্বারা শরীরের তাপ দেখিত এবং সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিত। রাত্রিতে উঠিয়া আর থার্ম্মমিটার দিতে পারিত না এবং জ্বর কত হইত, তাহাও জানিতে পারিত না। সে কখন কখন তাহার দিদি শাশুড়ীকে বলিত "ঠাকুর মা! আমাদের এদিন থাক্‌বে না; পাচিকাও আস্‌বে, চাকরদেরও ব্যারাম সার্বে।" ক্রমে যখন শরীর দুর্ব্বল হইল, তখন কুসুম আর তাহার রাত্রিবাস কাপড় ধৌত করিতে পারে নাই। সরলতা এক দিবস বলিল, "কুসুম! তুমি এক কাপড় পরে থাক?" কুসুম উত্তর করিল, "আমি আর এখন কাপড় ধুইতে পারি না, আমার কাপড়

ধুইয়া দিবে কে? এই সকল বিবরণ আমার স্ত্রী পূর্ণবাবুর বাটীর স্ত্রীলোক দিগের নিকট শুনিয়াছে। এই ভাবে ২৬শা পৌষ গত হইল। সেই তারিখে কুসুম আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিল। ইহাই তাহার স্বহস্তের শেষ পত্র। ইহার পর আর তাহার পত্র লিখিবার শক্তি ছিল না। ক্রমশঃ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ২৭শা পৌষ পর্য্যন্ত কুসুম হাটিতে পারিত। সেই দিবস রাত্রিতে দীনবন্ধু দত্ত হারণ্ সাহেবের ঔষধ নিয়া আবিধারা গিয়াছিল এবং কুসুম এক দাগ মাত্র ঔষধ সেবন করিয়াছিল। ২৮শা পৌষ কুসুমের দাড়াইবার শক্তি ছিল না। আহারের পর প্রতিদিন তিন বার ঔষধ সেবনের নিয়ম ছিল। কিন্তু ২৮শা পৌষ দুই বার মাত্র ঔষধ সেবন করিয়াছিল। ২৮শা পৌষ পূর্ণবাবু আমাকে লিখিলেন, "গত কল্য দীনবন্ধু দত্ত ঔষধ দিয়া গিয়াছে। ইহা বাহের কি জ্বরের ঔষধ, তাহা জানিতে পারিলাম না। দুই দিবস কুইনাইন দেই নাই। অদ্য পুনরায় কুইনাইন দিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ভারি অশান্তিতে আছি, কুসুম ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া কুসুমকে ২রা কি ৩রা মাঘ নিয়া যাইবেন। সরোজিনীর কন্যাটি বোধ হয় বাঁচিবে না। আমার শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ এখনও আমার পরিবারকে জানাই নাই।"

৩০শা পৌষ সন্ধ্যার পর কুসুম তাহার শাশুড়ীকে বলিল, "আমার মা বাড়ী এসেছেন।" তিনি বলিলেন, "তুমি কেমন করে জান্‌লে?" কুসুম বলিল, "এই ত আমার জন্য পাওয়ারুটি ও বিস্কুট পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

কুসুম যে কোঠায় খাটের উপর শয়ন করিত, সেই কোঠার অপরাংশে সরোজিনী, তাহার রুগ্না কন্যাটি ও তাহার প্রসূতি শয়ন করিত। সরোজিনীর কন্যাটির গায়ে ঘা হইয়াছিল। সে যাতনায় সমস্ত দিনরাত্রি ক্রন্দন করিত। সরোজিনী তাহার মৃতপ্রায় কন্যাটির জন্য সর্ব্বদা

বিলাপ করিত। তাহার মাতা ও পিতামহী সেই রুগ্না বালিকাটিকে ক্রোড়ে করিয়া যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিত। রাত্রিতে কুসুমের দিদিশাশুড়ী পরবর্ত্তী এক কোঠায় শয়ন করিত। দুর্ব্বল শরীর, বুকে কফের বেদনা, শ্বাস প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, এরূপ অবস্থায় কুসুম কাশিতে কাশিতে অস্থির হইত, কিন্তু কেহ অসন্তুষ্ট হইবে ভয়ে কাহাকেও নিকটে বসিতে অনুরোধ করিত না, নীরবে এই কঠোর যাতনা সহ্য করিত। বিধাতার কেমন বিধান, যাহার অসুখ হইলে প্রতিদিন চিকিৎসক উপস্থিত রহিয়াছে, যাহার অসুখ হইলে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, পিতৃব্যগণ, খুল্যতাতভ্রাতা, পিসী, মাসী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সদা শুশ্রূষা করিয়াছে, এত দীর্ঘকাল সে একাকিনী রুগ্নশয্যায় শায়িত।

২৭শা পৌষ হইতে ২রা মাঘ পর্য্যন্ত কুসুমের জ্বর কত হইত, আমি জানিতে পারি নাই। ২রা মাঘ রাত্রিতে কুসুমের দিদিশাশুড়ী এবং ৩রা ও ৪ঠা মাঘ রাত্রিতে তাহার শাশুড়ী তাহার নিকট শয়ন করিয়াছিলেন।

৩রা মাঘ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় দ্বিজেন্দ্র পূর্ণবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কুসুম হাতে আকাশ পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, মা, দাদা আর বাটীর আর সকলে কেমন আছেন?” “আপনার কাজে কত টাকা লাভ হয়েছে?” এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন করিল। দ্বিজেন্দ্র তাহাকে পরদিবস কামারগাঁয়ে নিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। সে বলিল “অদ্য অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়াছে, পেটে ও কোমরে বেদনা, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমি যেতে পার্ব্ব কি?” দ্বিজেন্দ্র বলিল, “কেন? তোমাকে নৌকা করিয়া নিয়া যাব।” তখন কুসুম তাহার শ্বশ্রূমাতাকে বলিল, “মা রাঙ্গাদাদা আমাকে কাল কামারগাঁয়ে নিতে চান।” তিনি বলিলেন, “না, তোমার এমন দুর্ব্বলশরীর, তুমি কি কাইল

যাইতে পার ? তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দিয়া তোমার মাকে এখানে নিয়া এস।” কুসুম বলিল, “রাঙ্গাদাদা আজ এই হেটে এসেছেন, তাঁহার আবার কাল যেতে কষ্ট হবে, দেওয়াঞ্জিকে ডেকে পাঠিয়ে দিন।” তিনি দেওয়াঞ্জিকে ডাকিয়া বলিলেন, “কুসুমের মাকে কা’ল নিয়ে এস।”

৪ঠা মাঘ বেলা আট ঘটিকার সময় কুসুম পঞ্চম মাসে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সন্তানটি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল জীবিত ছিল। (Man proposes God disposes) মনুষ্যে কল্পনা করে, ভগবান্ বিধান করেন। আমি ৩রা মাঘ কুসুমকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইব লিখিয়াছিলাম। সেই দিবস তাহার রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। ৪ঠা মাঘ কামারগাঁয়ে নিবার কথা ছিল। সেই দিবস তাহার প্রসব হইল। প্রসবের পর কুসুমের শ্বশ্রূমাতা কুসুমকে পরিষ্কার করিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। কুসুম তাহার শাশুড়ীকে বলিল “মা আপনার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল।”

পুত্র সন্তানটি নষ্ট হওয়ার পর বাটীর সকলে বিষণ্ণ হইল এবং বলিতে আরম্ভ করিল, “বাপ কি ঔষধ পাঠাইয়াছে, তাহাতেই এই সর্ব্বনাশ হইল। হারণ্ সাহেব ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতের চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুকাল যাবৎ চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন। হাজারিবাগ, রাঁচি, গিরিডি ও চাত্রা প্রভৃতি স্থানের চিকিৎসালয় সমূহ পরিদর্শন করেন। হাজারিবাগে যখন কাহারও কোন কঠিন ব্যারাম হয়, তখনই তিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে দেখেন। কাহারও নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রতি সকলেরই অটল

বিশ্বাস। ১২ই পৌষ তারিখের চিঠিতে যে অবস্থা লিখিত ছিল, সেই অবস্থানুসারে তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৭শে পৌষ হইতে সেই ঔষধ সেবন করান হয়।

৪ঠা মাঘ রবিবার মামুদপুর ডাক্তারের জন্য লোক পাঠান হইয়াছিল। তথা হইতে কালাচাঁদ সাহা ডাক্তার সেই দিবস বেলা ১১ এগার ঘটিকার সময় আবিধারা উপস্থিত হইল। সে কুসুমের প্রসব হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং বলিল, "এখন আর কোন ভয়ের কারণ নাই। এখন রোগী সহজে আরাম করা যাইবে। প্রসব না হইলে আমারই এই কার্য্য করিতে হইত। আপনারা এজন্য এত বিষণ্ণ হইলেন কেন?" তিনি ঔষধ দিলেন এবং দুগ্ধবার্লি পথ্য ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাকে ৮ই মাঘ বৃহস্পতি বার আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ঔষধে কিরূপ ফল হয়, তাহা জানাইতে বলিয়া তিনি মামুদপুর চলিয়া গেলেন।

৪ঠা মাঘ দ্বিজেন্দ্র আমাকে লিখিয়াছিল, "প্রসবের পর কুসুম তাহার শরীর অনেক পাতলা বোধ করে। গত কল্য বেলা ১১টার সময় তাহার জ্বর ১০১ ছিল, রাত্রে কিম্বা বৈকালে আর থার্ম্মমিটার দেওয়া হয় নাই। অদ্য সকাল বেলা ১০১° ডিগ্রী দেখা গেল।"

৫ই মাঘ সন্ধ্যার পর কুসুমের প্রসূতি আবিধারা উপস্থিত হইল। পূর্ণবাবুর একটি ভৃত্য সেই দিবস এবং পাচিকাটি তাহার পূর্ব্ব দিবস স্বীয় কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছিল। কুসুম পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, "ঠাকুরমা! আমাদের এ দিন থাক্‌বে না।" সেই দিবস সকালবেলা তাহার জ্বর ১০১ ডিগ্রী ছিল, বেলা ১২টা হইতে সমস্ত দিনরাত্রি ১০২ ডিক্রী জ্বর ছিল। ৪ঠা ও ৫ই মাঘ কুসুম কালাচাঁদ সাহার ঔষধ সেবন করিয়াছিল।

কুসুমের নিকট তাহার প্রসূতি উপস্থিত হইলে, সে তাহার শ্বশ্রূ-

মাতাকে বলিল, "আমার মা এসেছেন।" তাহার পর তাহার প্রস্থতির সঙ্গের পরিচারিকাকে বাটীর সকল স্ত্রীলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া পরিচারিকার ছেলের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। তাহার প্রস্থতির হস্তে ঔষধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?" তাহার প্রস্থতি উত্তর করিল, "এ রক্ত বন্ধের ঔষধ"। কুসুম বলিল, "আমার আর রক্তস্রাব হয় না।" সে ঔষধ আর সেবন করান হইল না, ঔষধের শিশি দুইটি কুসুমের খাটের নীচে রাখিয়া দেওয়া হইল। বিধাতার বিধান বুঝা ভার। গত বার ব্যারামের সময় ঝড়বৃষ্টি দ্বারা কুসুমের ঢাকা যাওয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। এবার ব্যারামের সময় তাহার স্বহস্ত-লিখিত রোগের প্রকৃত অবস্থা শুনিয়া হারণ্ সাহেব জ্বর, কফ, লিভার্, এবং বুকের ও পিঠের বেদনার জন্য যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা রক্তবন্ধের ঔষধ ধারণায় সেবন করান হইল না।

৪ঠা মাঘ কুসুম বলিয়াছিল, "রাঙ্গাদাদা! আমিও কামারগাঁ গেলাম না, আপনিও কামারগাঁ গেলেন না। মা অস্থির হবেন।" ৫ই মাঘ যখন তাহার প্রস্থতি তাহাকে আহার করায়, তখন সে বলিল, "রাঙ্গাদাদা! মার মাথা এখনও ঠিক হয় নাই। মা ভেবেছেন আমার কতই না কি হয়েছে।" আহারের পর সে তাহার প্রসূতিকে বলিল, "মা! আমার ননদের মেয়েটি দেখে এস।" সেই সময় দ্বিজেন্দ্র বলিল, "হারণ্ সাহেবের ঔষধ খেয়েই কুসুমের জ্বর বেড়েছে।" তখন কুসুম বলিল, 'হারণ্ সাহেবের ঔষধ খেয়ে আমার জ্বর বাড়্‌বে কেন? আমার জ্বর তাহার পূর্ব্বেই বেড়েছে।'

৬ই মাঘ সকাল বেলা হইতে কুসুমের জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সে তাহার প্রস্থতিকে বলিল, "মা! রাঙ্গাদাদা আমার

অবস্থা ডাক্তারকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারেন না, শ্যামাচরণ ডাক্তারকে ভাগ্যকুল হইতে আনাও, আমি নিজে তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বলিব। তুমি টাকা এনেছ?” সে বলিল, “এনেছি। দ্বিজেন্দ্র তখন পূর্ণবাবুর নিকট শ্যামাচরণ ডাক্তারকে আনাইবার প্রস্তাব করিল। পূর্ণবাবু বলিলেন, “ধৈর্য্য ধরুন”। দ্বিজেন্দ্র বলিল, “ধৈর্য্য ধরি কি করে? উপকার দেখ্‌লে ত ধৈর্য্য ধর্ব্ব?” দ্বিজেন্দ্র বারম্বার বলাতেও তিনি স্বীকার পাইলেন না। দ্বিজেন্দ্র কুসুমের নিকট এই সকল কথা বলাতে, সে বলিল, “তবে কবিরাজকেই ডাকুন।” তখন পূর্ণবাবু ভীমা কবিরাজকে বলিলেন, “মনোযোগ ক’রে চিকিৎসা কর, ভাল ঔষধ পত্র দেও।” ভীমা কবিরাজ জাতিতে নাপিত। গ্রামে কবিরাজি ব্যবসা করে। সেই ঐ গ্রামে একমাত্র চিকিৎসক। পূর্ণবাবুর বাটীতে যখন কাহারও কোন সামান্য ব্যারাম হয়, তখন সেই চিকিৎসা করে। কুসুমের এই রোগের প্রথম অবস্থায় কতক দিবস ভীমা কবিরাজই চিকিৎসা করিয়াছিল; কিন্তু কোন সুফল দেখাইতে পারে নাই। পূর্ণবাবু দ্বিজেন্দ্রকে বলিলেন, “ভীমা আমার আপন লোক। বাড়ীর নিকটস্থ; ও খারাপ ঔষধ দিতে পারিবে না, আর মনোযোগ ক’রে চিকিৎসা কর্ব্বে।” দ্বিজেন্দ্র ভীমা কবিরাজকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দেখ তুমি চিকিৎসা করিতে সাহস পাও ত?” সে বলিল, “আরাম কর্ত্তে পার্ব্ব ক’রে ত সাহস করি, এখন ঈশ্বর ইচ্ছা।”

সেই দিবসই পূর্ণবাবু তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার স্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন। পূর্ণবাবুর স্ত্রী পিতৃশোকে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। কফ, কাশী ও লিভারের জন্য কুসুমের প্রসূতি তাহার বুকে ঔষধ মালিস করিতেছিল। শাশুড়ীর ক্রন্দন শুনিয়া কুসুম

তাহার জননীকে বলিল "মা! আমার শাশুড়ীর নিকট যাও।" তখন সে তাহার শাশুড়ীর নিকটে গেল।

শেষ বেলাতে কুসুমের জ্বর ১০৪° হইল। জ্বর দেখিবার সময় তাহার প্রসূতি তাহার পথ্যাদি প্রস্তুত জন্য অন্যত্র ছিল। সে দ্বিজেন্দ্রকে বলিল "রাঙ্গাদাদা! আমার যে জ্বর বেড়েছে একথা মাকে যেন বলেন না।" রাত্রিতে তাহার জ্বর ১০৫° হইল।

৭ই মাঘ প্রভাতে কুসুমের গর্ভধারিণী ডাক্তার আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া দ্বিজেন্দ্রকে পূর্ণবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল। দ্বিজেন্দ্র পূর্ণবাবুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তাঁয়ৈ মহাশয় বলিলেন, আমার বাটীতে থাকিয়া স্বাধীনতা চলিবে না। আপনাদের বাটীতে নিয়া সিবিলসার্জন আনুন।" আমার বোধ হয় তাঁহার ধারণা ছিল, কবিরাজের ঔষধেই কুসুম আরাম হইবে। কুসুম এই কথা শুনিয়া নীরব রহিল। কিছু পরে কুসুমের জ্বর ১০২° ডিগ্রী হইল।

আবিধারা গ্রামে একটি ভদ্রমহিলা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "অসময়ে সন্তান হওয়ার পর প্রসূতিকে বেশী দুগ্ধ দিলে নাড়ী পাক্‌বে।" কবিরাজ দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিল। কুসুম বালি-সাগু আহার করিতে পারিত না, তাহার শরীরও দুর্ব্বল এবং প্রায় রক্ত শূন্য। সেই জন্য সে বলিল, "যদি দুধ দিয়া একটু সাদা করিয়া দেওয়া হয় তবে বার্লি খেতে পারি।" কুসুমকে কখন শুদ্ধ বার্লি এবং কখন বা মুগের যুস দেওয়া হইত। রাত্রি তিনটার সময় সরোজিনীর কন্যাটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। সরোজিনী ও তাহার প্রসূতি মৃত কন্যাটি নিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ক্রন্দন শুনিয়া কুসুম জিজ্ঞাসা করিল "মা! মেয়েটি কি গিয়েছে?" তাহার

জননী বলিল, "মেয়েটি গিয়েছে, তোমার ভয় কি? আমি তোমার নিকটে আছি।"

৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার নিশি প্রভাত হইল, পূর্ণবাবু মামুদপুরের ডাক্তারকে সেদিন আবিধারা আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কুসুমের প্রসূতি গৃহ হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময় কুসুমের দিদি-শাশুড়ীর হাঁচি হইল; সে কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করিয়া অন্য দ্বার দ্বারা বহির্গত হইল। তৎপর সে কুসুমের মূত্র বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া পূর্ণবাবুর বাহিরের চাকরাণীকে মুগডাইল প্রস্তুত করিতে বলিল এবং কুসুমের মুখ প্রক্ষালন করিল। রাত্রিতে কুসুম যে মূত্রত্যাগ করিয়াছিল, তাহা ফেলিয়া দিবার সময় তাহার প্রসূতি দেখিল যে, সে গুল যেন শুদ্ধ চূণগোলা। কুসুমের জননী তাহার দাইকে কুসুমের নিকট রাখিয়া মুগের যুস প্রস্তুত করিতে গেল। ইতিমধ্যে কুসুম পুনরায় চূণের মত প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করিল। তখন কুসুম দাইকে বলিল, "মাকে ডাক্।" কুসুমের মাতা আসিয়া তাহাকে প্রস্রাব করাইল। তাহার পর দ্বিজেন্দ্র, পূর্ণবাবু ও ভীমা কবিরাজ আসিয়া কুসুমকে দেখিল। দ্বিজেন্দ্র কবিরাজকে প্রস্রাব দেখাইল। কবিরাজ বলিল, "ইহার ঔষধ ত এখন দেওয়া যায় না; ইহার পরে দিব।" সুরেশের মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিরাজকে প্রস্রাব দেখাইয়াছ?" দ্বিজেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ," তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণকে দেখাইয়াছ?" কুসুম উত্তর করিল, "তিনি দেখ্‌লেন্ না।" এমন সময় দ্বিজেন্দ্র ডাকিয়া বলিল, "সোণামামি! কুসুমের দাঁত লেগেছে, শীঘ্র যুস আনুন।" যুস খাওয়ার পর কুসুমের দাঁত কপাটি ছাড়িল। সে সময় তাহার জ্বর ১০২ ডিগ্রী ছিল। তাহার পর তাহার হস্তপদ শীতল হইতে আরম্ভ হইল। তাহার মাতা কবুতরের যুস ও তিসির পুল্‌টিস্ প্রস্তুত করিতে গেল,

তাহার দিদি শাশুড়ী তখন তাহার মাথায় বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সে বলিল, "ঠাকুরমা! আপনি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে বাতাস করেন, আপনার কষ্ট হয়, থাক্ বাতাস দিয়ে কাজ নাই।" তাঁহার পর কুসুমের শাশুড়ী কুসুমের প্রসূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম কেমন আছে?" সে বলিল, "আর কেমন?" তখন সরোজিনী বলিল, "চল মা, বৌঠাইরাইন্‌কে দেখি যেয়ে"। কুসুমের তখন ঘন ঘন দাঁত কপাটি লাগিতেছিল। তাহার এই অবস্থা দর্শনে তাহার শাশুড়ী বলিলেন, "আপনারা ডাক্তার আনলেন্‌না কেন?" তাহার প্রসূতি বলিল, "বিয়াই যে রাগারাগি করেন।" তাহার শাশুড়ী বলিলেন, আমি ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, "তাদের যাকে ইচ্ছা তাকে আনুক।" কুসুমের প্রসূতি নিঃশব্দ রহিল। কুসুম অতি মৃদু ও মধুরস্বরে বলিল, "রাগ ক'রে সেন বল্লেন।" কুসুমের শাশুড়ী বলিলেন, "রাগে কি যাইত?" কুসুম নীরব রহিল।

বেলা দশটার সময় অনেকে কুসুমের হাতে পায়ে তার্পিন তৈল মালিস করিতেছে, এমন সময় দুই এক চামিস্ কবুতরের যুস খাওয়ান হইয়াছিল। ভীমা কবিরাজ বলিল, "ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর কবুতরের যুস দিবেন না।" সেই সময় পূর্ণবাবুর প্রতিবাসী দ্বারিক চক্রবর্ত্তী মহাশয় কুসুমের হাত দেখিয়া বলিলেন, "টাকার জন্যও নয় কড়ির জন্যও নয়।" এই কথা শুনিয়া বাটীর কেহ কেহ বলিল, "আর এক জন কবিরাজের জন্য লোক পাঠান হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "তাহার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা সহিবে না।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন কুসুমের শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম,

তোমার হাত দেখ্‌ল কে ?" কুসুম উত্তর করিল, "দ্বারিক ঠাকুর।" তাহার পর বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোক দিগকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, ইনি কে ? কুসুম বলিল, "খুড়ীমা" ; ইনি কে ? কুসুম বলিল, "বড় ঠাকুরমা" ; ইনি কে ? "ছোট ঠাকুরমা" ; ইনি কে ? "কবিরাজ ভীম।" তাহার পর কুসুমের প্রসূতি তাহার শাশুড়ীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ, কে ?" কুসুম ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

দ্বারিকা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "হাত পা ঠাণ্ডা হয়েছে ; বালির সেক দিতে পারেন।" তখন কুসুমকে বালির সেক দেওয়া আরম্ভ হইল। বেলা দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর কস্তুরি ভৈরব, বসন্ত-তিলক প্রভৃতি ঔষধ কুসুমকে সেবন করান হইল।

গত সন যখন কুসুমের হস্ত পদ শীতল হইয়াছিল, তখন কুসুম তাহার প্রসূতিকে বলিল, "মা ! একটুকু দুধ দাও ?" তাহার প্রসূতি গরম দুগ্ধ দিল। কুসুম তাহা পান করিল। জলদা ও আমার স্ত্রী কুসুমের হাতে পায়ে তার্পিণ মালিস করিল। কুসুম সুস্থ হইল। এবার কুসুম বেলা দুইটার সময় বলিল, "আমাকে দুধ না দিলে আমি মর্ব্ব ?" ভীম কবিরাজ বলিল, "দুধ না দিলে মর্ব্বেন না ?" কুসুম নীরব রহিল। বিধাতা কোন্ সময়ে কি উদ্দেশ্যে কি বিধান করেন, তিমিরাচ্ছন্ন মানবগণ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা যখন কুসুমের আসন্নমৃত্যু আশঙ্কা করিয়া তাহার জ্ঞান ও দৃষ্টি শক্তির পরীক্ষা করিল, তখনও ভীমা কবিরাজ বলিল, "দুধ না দিলে মর্ব্বেন না।" এই চিকিৎসকের হস্তে আমার অতি আদরের ধন, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, স্নেহের পুতুল, কুসুমের চিকিৎসা ন্যস্ত ছিল।

বেলা আড়াইটার ৫। ৬ মিনিট পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্র থার্ম্মামিটার দিল। কুসুম নিজে থার্ম্মামিটার নিয়া দেখিল। কপাট বন্ধ থাকা হেতু একটুকু অন্ধকার ছিল। কপাট খুলিতে বলিল। কপাট খোলা হইলে পর ১০২ ডিগ্রী জ্বর দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রের হাতে থার্ম্মামিটার দিল। মিনিট দুই তিন পরে তাহার প্রসূতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কুসুম বলিল, "টেলিগ্রাম।" তাহার পর তাহার দুই নয়ন বিস্ফারিত হইল ও ললাট ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত হইল। কুসুমের শাশুড়ী বলিলেন, "কপাল ত ঘাম্‌ছে!" এই কথা শুনিয়া কুসুমের খুড় শ্বশুর সুরেশ বাবু তারক বসু এবং পূর্ণবাবুর একটি চাকর, একখানা কম্বল নীচে বিছাইয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে সেই কম্বলের উপর নামাইয়া বাহিরে নিলেন। মহাশ্বাস এবং হিক্কা হয় নাই দেখিয়া দ্বিজেন্দ্র বলিল, "কুসুমেরে বাহির করে কেন?" বেলা আড়াইটার সময় কুসুম আকাশ পানে চাহিয়া চক্ষু নিমিলিত করিল। বাহির করিবার দুই তিন সেকেণ্ড মধ্যেই কুসুম মানবদেহ পরিত্যাগ করিল, চৌদ্দ বৎসর ছয় মাস সাত দিনে কুসুমের অভিনয় শেষ হইল।

"মঙ্গল আলয় তুমি, করুণাসাগর বিভু।
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা, হোক সফল প্রভু॥
আমি কে যে জগতের, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি।
তোমার জগত তুমি, যাহা ইচ্ছা কর হরি॥"

যোগেশের হস্তে কুসুমকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। সে তখন ভাগলপুর কলেজে পড়ে এবং হয় ত কুসুমের ব্যারাম সম্বন্ধে কিছুই জানিত না এবং জানিলেও পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত বাড়ী যাইতে পারিত না এবং বাড়ী থাকিলেও বোধ হয় লজ্জাবশতঃ কুসুমের শুশ্রূষা করিতে পারিত না। বাল্যবিবাহই এইরূপ শোচনীয় ঘটনার মূল। ভারতে হিন্দু-পরিবারে এইরূপ লক্ষ লক্ষ শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। রাজার ইচ্ছা

হইলেই বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন অতি সহজে সাধিত হইতে পারে।

কুসুম যখন অষ্টম বর্ষ বয়সে পদার্পন করিয়াছিল, তখনই সে লিখিয়াছিল।

করুণা-সাগর পিতঃ অখিলের পতি।
তোমার চরণ যুগে অসংখ্য প্রণতি॥
তোমার আদেশে প্রভু জনম ধারণ।
তব রাঙ্গা পদে আমি নিলাম শরণ॥

সাতবৎসরের বালিকা মঙ্গলাচরণ করিয়া তাহার জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ভগবন্! তুমি তাহাকে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধি-জন্য জগতে প্রেরণ করিয়াছিলে। সে তোমার আদেশ পালন করিয়া তোমার নিকট গমন করিয়াছে। কুসুম অনেক সময় বলিত, "যীশুখৃষ্টের মত কেহ সহিষ্ণুতা জগতে দেখাইতে পারে নাই। পাপী মানবদের উদ্ধারের জন্য তিনি আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতির সহিষ্ণুতাই একমাত্র অবলম্বন।" সে নিজেও অপরিসীম সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে। ভগবন্! আমার বোধ হয় তুমি তাহাকে হিন্দুবালিকাদের উদ্ধার সাধন জন্যই অবনীতে প্রেরণ করিয়াছিলে। সে অপার যাতনা ভোগ করিয়া এবং সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অবলা হিন্দুবালিকাদের উদ্ধার সাধন জন্য আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। জগদীশ! এখনও কি হিন্দুবালিকাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? এক বার তাহাদের প্রতি করুণাবলোকন কর, তাহাদের যাতনার শেষ কর, লোকের সুমতি দান কর, রাজাকেও রাজপ্রতিনিধিকে সুমতি দাও, বালিকাবিবাহ জগৎ হইতে তিরোহিত হউক। সম্রাট্ এডওয়ার্ড! তোমার উপায়হীনা বালিকা প্রজাদের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি

কর। এক বার অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কত অসংখ্য বালিকা স্বামীগৃহে কত অপার যাতনা ভোগ করিতেছে। লর্ড কুর্জ্জন! তোমার মত শিক্ষিত রাজপ্রতিনিধি এপর্য্যন্ত ভারতে আর কেহ আইসে নাই। তোমারই শাসন সময়ে কুসুম হিন্দুবালিকাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অপরিসীম সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের উদ্ধার সাধনে আত্মজীবন বলিদান করিয়াছে। তুমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ভারতে কত শত বালিকা কত যাতনা ভোগ করিতেছে। তুমি ভারতের মঙ্গল সাধন জন্য বহুবিধ উদ্যোগ চেষ্টা করিতেছ। বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া হিন্দুবালিকাদের যাতনা দূর কর। তোমার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইবে। গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা ভাসান এবং সতীদাহ নিবারণ করিয়া তোমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যেমন অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তুমিও বাল্যবিবাহের বিনাশ সাধন করিয়া চিরস্থায়ী যশে যশস্বী হও; তোমার নাম অবলা বালিকাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে। আমাদের দেশে হিন্দুরাজাদের সময়ে সামাজিক নিয়ম রাজা কর্ত্তৃকই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তখন রাজা স্বজাতীয় এবং স্বীয়ধর্ম্মালম্বী ছিলেন। এখন রাজা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কি প্রজাকুল উৎসন্ন যাইবে? ভারত যখন স্বাধীন এবং জ্ঞানালোকে দীপ্তিমান ছিল, তখন এখানে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল না।

তোমাদের অনুগ্রহে যখন কিছু জ্ঞানালোক ভারতে পুনঃপ্রদীপ্ত হইয়াছে, অনেক লোক শিক্ষিত হইয়াছে, তুমি একবার এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অসংখ্য পৃষ্ঠপোষক পাইবে। ভগবান্ তোমার সাহায্য করিবেন, তুমি সফলমনোরথ হইবে; স্বর্গীয় পিতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। হিন্দুভ্রাতৃগণ! তোমাদের কি এখনও চৈতন্য হয় নাই? তোমাদের অনেকেরই ত কন্যা আছে। যাহার কন্যা আছে, তাহারই ত এরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়। আমার মত ভুক্তভোগী ভারতে

অসংখ্য। আমি আর কুসুমকে ইহলোকে ফিরিয়া পাইব না; কিন্তু আমি তোমাদেরই মঙ্গল কামনায় তোমাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, এক বার আপন আপন কন্যাগণের দারুণ যাতনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহাদিগকে কঠোর যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর। কুসুমের দশা তোমাদের ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। বদ্ধপরিকর হইয়া তোমাদের আত্মজাদের দুর্দ্দশা দূর কর। নিজেরা না পার আপন আপন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আবেদন কর; তাঁহারা তোমাদের দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন। বঙ্গেশ্বর! একবার বঙ্গের সামাজিক দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বঙ্গীয় হিন্দুদের গৃহে গৃহে বালিকাদের কুসুমের দশা ঘটে কি না। তুমি কৃপা করিয়া একটুকু অনুসন্ধান কর, তবেই জানিতে পারিবে, বাল্যবিবাহে তোমার প্রজাদের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে।

সহৃদয় পাঠকগণ! তোমাদের হৃদয় কি দ্রবীভূত হইবেনা? তোমরা কি দেশের কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করিবে না? তোমরা চেষ্টা করিয়া বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ সাধন করিলে, ভারতের মঙ্গল হইবে এবং শোকাতুরা কুসুম-জননী শোক দূর করিয়া শান্তিলাভ করিবে।

পরিশিষ্ট।

আমার স্ত্রী যে দিবস বাটী হইতে হাজারিবাগ পুনঃ আসিয়াছে, সেই দিবস আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভূপতিমোহন আমাকে কতকগুলি কাগজ দেখাইয়া বলিল, এই কাগজগুলি কুসুম লিখিয়াছিল। আমি বলিলাম, "রাখিয়া দেও।" পরে দ্বিজেন্দ্রের নিকট শুনিতে পাইলাম, কুসুম "নিশীথ-স্বপ্ন" নামক প্রবন্ধ লিখিতেছিল। এই কথা শুনিয়া সেই

কাগজগুলির জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহা আর পাইলাম না। বাজে কাগজের মধ্যে তাহার হাতের পেন্সিলের লিখিত একখানা কাগজ পাইলাম। সেই কাগজখানা দৃষ্টে বোধ হইল, উহা "নিশীথ-স্বপ্নের একখানা খসরা কাগজ। তাহাতে লিখিয়াছিল, —"সে দিবস আমরা ফিরিয়া আসিলাম; মনে কেবল সেই শোভাই জাগিতে লাগিল; যেন একখানা ছবি। পরদিন অভ্যাস অনুসারে খুব সকালে উঠিলাম; কি স্নুন্দর শোভা! নবোদিত সূর্য্যকিরণ নদীতে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে; অসংখ্য বিচীমালা কিরণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। প্রভাত-সমীরণ-সংযোগে স্নরধুনীবক্ষ মৃদু মৃদু নৃত্য করিতেছে। উদয়োন্মুখ প্রাতঃ সূর্য্যের আরক্তিম কিরণমালা তদুপরি বিক্ষিপ্ত হইয়া কি অনুপম শোভার সঞ্চার হইয়াছে। আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। আর দেখিতে পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইল, যেন পর্ব্ব-তের মধ্যদেশে শত শত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হইয়াছে। শিরোদেশে শ্বেত বরফ রাশির উপর নবোদিত সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে সেগুলিও যেন একটি সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতেছিল। প্রকৃতির শোভার যে এত বৈচিত্র আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আজ দেখিয়া দেখিয়া আমার স্রষ্টার প্রতি"—

দ্বিজেন্দ্র বলে,"কুসুম পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া এই প্রবন্ধ তাহার সঙ্গে আবিধারা নিয়াছিল। তাহার স্বর্গারোহণের পাঁচ দিবস পূর্ব্বে আবিধারায় আমার সঙ্গে এই সম্বন্ধে সে আলাপ করিয়াছিল।"

বাজে কাগজের মধ্যে অন্য একখানা কাগজ পাওয়া গিয়াছে। তাহার শিরোভাগে লিখিত, "ইন্দুমতী শৈবালিনী" তাহার নীচে ময়ূরের মুখে একটি সর্পের ছবি অঙ্কিত, তাহার নীচে "আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা।"

ইন্দুমতী শৈবালিনী

ময়ূরের ছবি তাহার মুখে একটি সর্প

R. K. R. আমার হৃদয় আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা

আর একখানা কাগজে লিখিত আছে, "মাগো স্নেহময়ী, স্নেহময়ী বেশে" এবং "হে জগদীশ্বর অদ্য রজনীতে আমি যখন নিদ্রার জন্য শয়ন করিব, তখন যদি আমার মৃত্যু হয় তবে"—

৪ঠা মাঘ রাসমোহন যশোহর হইতে লিখিয়াছে,—

"যখন কোন স্থান হইতে কুসুমের সংবাদ পাই না, তখনই ভাবিয়াছিলাম, কুসুম বোধ হয় নাই। অদ্য আপনার মর্ম্মভেদী পত্রে সেই উদ্বিগ্ন দূর হইল। এখন যথার্থই কুসুমের জন্য আমাদের আর ভাবিতে হইবে না।

কুসুম এক দিন আমার নিকট আসিয়া বলিল, "চিনি কাকা! আমি এখন আনন্দের বাজারে যাই। সংসার বড়ই শোকদুঃখের স্থান। বাবা আর মা সর্ব্বদাই আমার জন্য চিন্তিত থাকেন। আমার এখন আর সংসার ভাবনা ভাবিতে হইবে না। আমার পিতা ও মাতা ঠাকুরাণী আমার শোকে বড়ই কাতর হইবেন। আমি ভিন্ন ইহাদের বাপ, মা বলিয়া ডাকিবার কেহ নাই। আপনি তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবেন, তাঁহারা যেন আমার জন্য শোক করেন না। আমি এখন

অতি আনন্দে থাকিব। এখানে রোগ শোকের কোন ভয় নাই।” এই বলিয়া যেন কুসুম চলিয়া গেল। ইহার পর আর সেই রাত্রিতে ঘুম হইল না। অদ্য আপনার মর্ম্মভেদী পত্র পাইয়া বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই মা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দাদা! কুসুম বলিয়াছে যে, এই সংসার শোকের আবাস স্থান, তাহা কি সত্য নয়? যখন কুসুমের অসুখ হইয়াছে, আমরা তাহার যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারি নাই। এখন আমাদের কুসুমের জন্য আর ভাবিতে হবে না। তাহার ঔষধ ও পথ্যাদির জন্য আমাদের দৌড়া-দৌড়ি করিতে হবে না। কুসুমের অসুখ হইলে, আমাদের দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, রাত্রি জাগিতে হয়, ইহা দেখিয়াই বোধ হয় কুসুম আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল। কৈ আমরা ত রাত্রি জাগিতে কি ঔষধ আনিতে, এক দিনও বিরক্ত হই নাই, তবে মা আমাদের মায়া ত্যাগ করিলেন কেন? কুসুম পূজায় বাটীতে আসিবে বলিয়া সকলকে বাটীতে আনাইয়াছিল। কিন্তু রাস্তায় আসিয়া আবিধারা যাওয়াই স্থির করিয়াছিল। কামারগাঁও আর তাহার যাইতে হবেনা বলিয়াই বোধ হয় আর গেল না।

দাদা! আমি আর আপনাকে কি প্রবোধ দিব? কুসুম এখন অতি সুখে আছে। আমরা তাহার জন্য শোক করিলে তাহার সুখের লাঘব হইবে। কুসুম কয়েক বৎসরের জন্য আপনার ঘরে বাস করিতে আসিয়াছিল। ১৩।১৪ বৎসরে তাহার সংসারের কাজ সমাধা করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। আপনার কুসুমের জন্য ভাবিবার আর কিছুই নাই।

৩রা ফেব্রুয়ারি রঙ্গপুর নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবু নলিনীকান্ত সান্যাল লিখিয়াছেন।

Your post card has quite overwhelmed me. At first

when I read it I could not believe my senses. But a second and third reading convinced me of the stern reality. Alas your lives have been rendered miserable for the rest of your days. May God in his mercy give you strength to bear the shock. Such an accomplished and lovely creature was not meant for this world.........

আপনার পোষ্টকার্ড পাঠে আমি সম্পূর্ণ রূপে অভিভূত হইয়াছি। প্রথম বার পাঠ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অবিশ্বাস হইল। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার পাঠে বুঝিলাম, ঘটনা সত্য। অবশিষ্ট সময়ের জন্য আপনাদের জীবন দুঃখময় হইল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করিয়া এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন। এমন গুণসম্পন্না ও লাবণ্যময়ী প্রাণী ইহজগতের জন্য নহে।

৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব বাবু লিখিয়াছেন—

I need hardly say how grieved we feel on hearing the very mournful intelligence conveyed in your letter of the 1st instant. The death of Kusum must have given you a terrible blow; she having been your only child and such a *good* and *clever* child she was. We deeply sympathise with you in your great sorrow. We trust and pray that our Heavenly Father will soon bring to you solace and comfort.

I regret I have not with me any of the verses which your good child composed extempore while she was here. I wish it so much that I had any of them. I shall, however, be so much pleased to read that you have got and which, you say, you are going to publish. Kindly send me a copy of the book when published.....

আপনার বর্ত্তমান মাসের ১লা তারিখের পত্রে লিখিত অতীব শোকজনক-সংবাদে যে আমরা কত শোকার্ত্ত হইয়াছি, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কুসুম আপনাদের একমাত্র সন্তান এবং এমন সচ্চরিত্রা ও গুণসম্পন্না সন্তান; তাহার মৃত্যুতে আপনাদের ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে। আপনাদের দুরূহ শোকে আমরা প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি, আমাদের স্বর্গীয় পিতা অবিলম্বে আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করিবেন। আপনার সচ্চরিত্রা কন্যা এখানে আসিয়া যে সকল উপস্থিত কবিতা রচনা করিয়াছিল, তাহার একটিও আমার নিকট নাই তজ্জন্য আমার দুঃখ হয়। আমার কতই ইচ্ছা হয় যে, তাহার একটিও যদি আমার নিকট থাকিত। আপনি যে গুলি পাইয়াছেন এবং মুদ্রিত করিবেন বলেন, সেই গুলি পড়িলে আমি অতীব সন্তোষলাভ করিব। মুদ্রিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে একখানা পুস্তক দিবেন।

২৩শা মাঘ পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন—

আপনার নিকট পত্র লিখিতে আর হাত সরে না। কি সংবাদ লিখিব ভাবিয়া আকুল। আপনার প্রাণাপেক্ষা আদরের ধন আমার গৃহলক্ষ্মী করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমি হতভাগা, আমার ভাগ্যে তাহা সহিবে কেন? সে পূর্ণ লক্ষ্মী মা আমার তাই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের কথা ভাবিতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। ভগবান্ আপনাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিলেন। আপনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনাকে অধিক লিখা বাহুল্য মাত্র। মনে কত আশা ছিল, আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে আত্মীয় পাইয়া কত সুখী হইয়াছিলাম। ভগবান্ সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিলেন। এতদিন আপনাকে পত্র লিখিনাই। এ শেল আমাদ্বারা আপনার বুকে দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই বলিয়াই

পত্র লিখি নাই। গত রবিবার তারকচন্দ্র বসুকে শ্রীযুক্তা বৈবাহিকা মহাশয়ার সংবাদ জানার জন্য কামারগ্রাম পাঠাইয়াছিলাম। তাহার বাচনিক অবগত হইলাম, বৈবাহিকা মহাশয়া ও দ্বিজেন্দ্র গত শনিবার হাজারিবাগ রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন এবং আপনিও এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীমান্ যোগেশকেও এসংবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই। এইক্ষণ বাধ্য হইয়া লিখিতে হইতেছে।

ঐশ্বরিক ঘটনা যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। যাহার যাইবার সে গিয়াছে। আমরা এইক্ষণ কেবল তাহার শোকস্মৃতি লইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব। যেমন আপনার আদরের ধন ছিল, আমিও আমার কন্যাপেক্ষা অধিক স্নেহে তাহাকে দেখিয়াছি। কি করিব, ঈশ্বর যাহা করিবেন, লোকের তাহাতে হাত নাই। ভগবান্ আপনাদের মনে শান্তিদান করুন, এইমাত্র প্রার্থনা। আপনার কন্যার মৃত্যুতে আমি যে প্রকার অশান্তিতে আছি, তাহা আমিই মাত্র জানি। যাহা হউক যাহা হইবার হইয়াছে, আর ফিরিয়া পাইব না।

২৩শে মাঘ পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন—

আমি আপনার কন্যার সুখস্বচ্ছন্দের জন্য আমার সাধ্য মত যত্ন চেষ্টা করিতে ক্রটি করি নাই। কত আশা করিয়াছিলাম, আমার সকল আশা নষ্ট হইল। আমার সুখের সংসারে অশান্তি প্রবেশ করিল।

এখানে ডাক্তার কবিরাজ অভাবে বড়ই অশান্তি। কুসুমের হঠাৎ এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে স্থানান্তর নেওয়ারও উপায় করিতে পারিলাম না। শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীমান্ যোগেশ ভাগল পুরেই সম্পাদন করিবে। মৃত্যু ৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার বেলা ২॥ আড়াইটার সময় কৃষ্ণা দশমী তিথিতে হইয়াছে। কুসুমের অস্থি গঙ্গাতে দেওয়ার জন্য রাখিয়াছি। আমিই মার অস্থি গঙ্গাতে দেওয়ার জন্য যাইব।

২৬শে ফেব্রুয়ারি রঙ্গপুর হইতে তথাকার জজ সাহেবের স্ত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় লিখিয়াছেন—

স্নেহের কুসুম আর ইহলোকে নাই শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। ফুল ফুটিতে না ফুটিতে ঝড়িয়া পড়িল। বিধাতার বিধান আমরা বুঝিতে পারি না।

সন্তান শোক কি, তাহা জানিয়াছি। কুসুম আপনার একমাত্র ধন। তাহার অকাল মৃত্যুতে আপনি কি বেদনা পাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি। আপনার এই দুঃসহ শোকে আমার গভীর সহানুভূতি জানিবেন। যাহারা থাকে, দুঃখ কষ্ট যাহা কিছু কেবল তাহাদেরই জন্য। যাহারা যায়, তাহারা রোগ শোক যন্ত্রণার অতীত স্থান লাভ করে। ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। প্রার্থনা করি, বিশ্বজননী আপনার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করুন।

১৮ই ফেব্রুয়ারি যোগেশ লিখিয়াছে—

… … আপনি জীবনচরিত লিখিতেছেন জানিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইলাম। আমি যাহা কিছু জানি, লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমি অধিক কিছু জানি না এবং লিখিতেও পারিব না।

আমি যতদূর জানি, কুসুমফুলের কত—তেমনি সুন্দর, তেমনি পবিত্র ছিল। তরল সৌন্দর্য্য তাহাতে ছিল না; কিন্তু স্ত্রীজাতিকে যাহাতে সুন্দর করে, তাহা তাহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় পরম দয়াল ঈশ্বর তাহাকে পৃথিবীর অপবিত্র ধূলিরাশি হইতে আদর করিয়া লইয়া নিয়া নিজস্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন।

দয়ামায়া প্রভৃতি বঙ্গমহিলার স্বভাবসিদ্ধ গুণ রাশি তাহাতে বিরাজমান ছিল। ভালবাসা তাহার স্বভাব—পরকে আপনার করিতে

বোধ হয় তাহার মত কেহ জানিত না। বোধ হইত যেন ভালবাসাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য—ভালবাসিয়াই সে চলিয়াগেল।

আমি তাহাকে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই। বোধ হয় সে মিথ্যা কথা বলিতে জানিত না। সে হয়ত ভাবিত, যাহার কথায় মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে না, সে মনুষ্যনামের অযোগ্য।

আপনি লিখিয়াছেন, "তোমরা বোধ হয় তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই।" বাস্তবিকই আমরা তাহাকে চিনিতে পারি নাই। মানুষের ধর্ম্মই এই যে অভাব না হইলে জিনিষের মূল্য বুঝে না। একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা এখন বেশ বুঝিতেছি। অধিক লিখিতে পারিতেছিনা। মন বড় খারাপ।

২রা ফাল্গুণ কোলা হইতে কুসুমের বড় মাসীমাতা মনোমোহিনী লিখিয়াছে—

... ... সংসারে সমস্তই একমাত্র কুসুম সম্বল ছিল। সে স্বর্গের কুসুম স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছে। এ পাপতাপ সংসারের যাতনা কি, তাহা কিছুই ভোগ করিল না। আদরের জিনিস আদরেই সংসারের খেলা শেষ করিয়া গেল... ... ... আমরাই কুসুমের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কথা ভুলিতে পারি না, পিতা মাতায় এত গুণ কিপ্রকারে ভুলিতে পারে?

১০ই ফাল্গুণ মনোমোহিনী লিখিয়াছে—

কুসুম কেমন সুখী আত্মা; আদরে হাসিয়া খেলিয়া সংসারের খেলা শেষ করিয়া গেল; আর আমরা কত লাঞ্ছনা পাইতেছি। এই ত কর্ম্মফল; তবু শিক্ষা হয় না। ঈশ্বরে মন নীতে পারি না, কেবল কুচিন্তায় কুভাবনায় দিনরাত্রি কাটাই।

১৯শে ফেব্রুয়ারি রাসমোহন আমার স্ত্রীর নিকট লিখিয়াছে—

আপনার নিকট পত্র লিখিব বলিয়া অনেক দিন যাবৎ চেষ্টা

করিতেছি; কিন্তু পারিতেছি না। কি লিখিব, লিখিবার আর কিছু দেখি না। মনুষ্যজাতি নির্ব্বোধ, তাই মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। কুসুমকে যথার্থ আমরা এ জন্মের মত হারাইয়াছি। কিন্তু কুসুম এখন বড়ই সুখে আছে। সংসারের দুঃখ তাহার আর ভোগ করিতে হবে না। কুসুম আপনার ঘরে কয়েক বৎসরের জন্য আসিয়াছিল। যে কয়দিন ছিল, কেবল রোগে কষ্ট পাইয়াছে। এখন আর তাহার রোগ শোকের ভয় নাই। বিবেচনা করিয়া দেখুন এই পৃথিবীতে আসিয়া কে কবে সুখে কাল কাটাইয়াছে। কুসুমের জন্য আপনি শোক করিবেন না। শোক করিলে কুসুমের স্বর্গসুখের লাঘব হইবে। আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি করিয়াছেন। এখন যাহাতে সে স্বর্গে সুখে বাস করিতে পারে, তাহাই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ... ... কুসুমের সমস্তই অলৌকিক ছিল। বোধ হয় অকালে সে আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া যাইবে বলিয়াই এত অল্প বয়সে সংসারের লীলা শেষ করিয়াছে। নতুবা কুসুম শৈবলিনীর অনেক ছোট। সে অল্প বয়সেই দুইটি সন্তানের মা। আমার বোধ হয়, শাপে স্বর্গ হইতে আসিয়া কয়েক বৎসরের জন্য আপনার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যখন অভিমন্যু ষোল বৎসরের সময় প্রাণ ত্যাগ করে, তখন অর্জ্জুন তাহার শোকে অস্থির হইলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহা আপনি জানেন। কুসুমের আচারব্যবহার এবং বুদ্ধি যে প্রকার ছিল, তাহাতে আমার বোধ হয় কুসুম শাপগ্রস্ত হইয়াই মানব-দেহ ধারণ করিয়া আপনার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নতুবা কোন্ অল্পবয়স্কা বালকবালিকাকে বলিবামাত্রেই শ্লোকরচনা করিতে দেখিয়াছেন? রোগশোকে সংসার পরিপূর্ণ দেখিয়াই কুসুম আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ছোড়দাদা বোধ হয় জানিতেন যে, কুসুম

অনেক দিন বাঁচিবে না। তাই কুসুমের বিবাহ এত সাধ করিয়া দিয়াছেন। নতুবা বাই থেমটা ত আমাদের বংশে আর কোন মেয়ের বিবাহে আইসে নাই। কুসুমের বিবাহে আমরা সমস্ত সাধই পুরাইয়াছি। পিতা মাতার যে কর্ত্তব্য কাজ, তাহা আপনারা যথাসাধ্য করিয়াছেন। মনের সাধ সমস্ত প্রকারেই পূরণ করিয়াছি। সৎপাত্রে দান, বড় ঘর ইত্যাদি সমস্তই দেখিয়া দিয়াছিলাম। কুসুম ত আপনার ঘরে কিংবা স্বামি-গৃহে কোন প্রকার কষ্ট পায় নাই। যাহারা সন্তানকে মনের সাধ মিটাইয়া খাওয়াইতে না পারে, অথবা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান না করিতে পারে, তাহাদেরই মনে চিরকাল কষ্ট থাকে। কিন্তু কুসুমকে কোন প্রকারেই আপনি কষ্ট দেন নাই। কুসুম এখন আপনার কাছে নাই বটে, কিন্তু যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার কোলে এখন আছে। এখন আমাদের আর তার জন্য ভাবিবার কিছুই নাই। ... ... কুসুম কে এবং কি ছিল, দাদার পুস্তক ছাপা হইলে জানিতে পারিব। কুসুমের কার্য্যকলাপ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমার কিছু দ্বিধা ছিল যে কুসুম অধিক দিন বাঁচিবে না।

ইহার পর আর একদিন রাসমোহন লিখিয়াছে—

আপনার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। লিখিতে বসিলেই চক্ষের জলে পত্র ভিজিয়া যায়। মা আমাদের যে এত শীঘ্র ছাড়িয়া স্বর্গে যাইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। শৈবালিনী লিখিয়াছে যে, কুসুমের সহিত তাহার যে প্রকার ভালবাসা ছিল, তাহার মায়ের পেটের ভাইভগ্নীর সহিতও সেই প্রকার ভালবাসা নাই। আর কুসুমের পত্রগুলি যখন সে খুলিয়া পড়ে, তখন তাহার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায় এবং ছোড় দাদা যে পূজার সময় তাহাকে বাড়ীতে নেন নাই, সেই জন্য বড়ই দুঃখিতা হইয়াছে। কুসুমের জন্য সকলেই শোক

করিতেছে। কুসুমের নিকট পিতা, মাতা, খুড়া, খুড়ী, জ্যেঠা, জ্যেঠী এমন কি আপন পর সকলই সমান ছিল। আপনি যদি কাহারো উপর রাগ করিয়াছেন, কুসুম তখনই আপনাকে মন্দ বলিয়াছে। কুসুমের বুদ্ধি ও বিবেচনা যে প্রকার ছিল, তাহাতে এপ্রকার মেয়ে আমাদের পাপ গৃহে থাকিবে কেন? মা লক্ষ্মী আমাদের অধিক দিন বাঁচিবে না, ইহা দাদা জানিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া কুসুমের বিবাহে এত আমোদ করিয়াছিলেন। কুসুমের মত রত্ন হারাইয়া আপনারাও শীঘ্র প্রাণ হারাইবেন। আপনার ও দাদার হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ হইয়াছে, সেই শেলই আপনাদের কাল, তাহা আমি বেশ বুঝি। কুসুমের শোক সহ্য করা অতি কঠিন ব্যাপার, তাহাও আমি বুঝি। দাদার শরীর নিতান্ত খারাপ, তাহার কারণও সেই শেল। আমরা কুসুমকে একা হারাই নাই। তাহার পিতা মাতাকেও আমরা অকালে হারাইব। আপনারা মণি হারাইয়াছেন ... ... প্রাণের পাখী উড়ে গেছে; শূন্য খাচা পড়ে আছে। তাই এত ভয়, কখন কি হয়। ... কুসুম গত সনই আমাদের মায়া ত্যাগ করিত; কিন্তু ছোড় দাদা সম্মুখে ছিলেন, তাই প্রাণ ছিল।

২১ ফেব্রুয়ারি রাসমোহন লিখিয়াছে—

I shall be very glad to read the life of Kusum written by you and to learn therefrom who Kusum was and where she came from. I always marked from her childhood that Kusum was not an ordinary being. Her amiable character, her presence of mind, and specially her ability in filling up rhyming verses then and there always reminded me that she was not an ordinary being.

আপনি কুসুমের জীবন চরিত লিখিলে তাহা পাঠ করিয়া এবং

কুসুম কে ছিল ও কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা জীবনচরিত পাঠে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। কুসুমের শৈশব হইতে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, সে সামান্যা মানবী ছিল না। মনোহরস্বভাব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিশেষতঃ তাহার উপস্থিত মত কবিতার পাদপূরণ ক্ষমতা দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে সামান্য প্রাণী নহে।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ভাগলপুর জিলাস্কুলের একজন শিক্ষক সতীশবাবু লিখিয়াছেন—

We have been extremely sorry to receive the sad news of the untimely death of your dear daughter. The news shocked my wife so much that she was about to fall when she was cooking. We regret her loss the more as she did not live long to do justice to her natural gifts.

আপনার প্রিয়কন্যার অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এই সংবাদ আমার পরিবারকে এত আঘাত দিয়াছিল যে, পাক করিবার সময় তাহার পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে আমাদের অধিক আক্ষেপের কারণ এই যে, তাহার স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশ করিতে সে সময় পাইল না।

পূর্ণবাবু ২৩শে ফেব্রুয়ারি লিখিয়াছেন—

আমি শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানাপ্রকার বিপদে জড়িত। ······ ভগবান আমাকে বড় অশান্তিতে রাখিয়াছেন। আপনার লিখিত মত কুসুমের হস্ত-লিখিত গানের পুস্তক খানা অদ্য বুক্‌পোষ্টে পাঠাইলাম; প্রাপ্তি সংবাদে বাধিত করিবেন। কুসুমের ফটো আপনার নিকট আছে কি না জনি না, যদি থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানা আমাকে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

৭ই মার্চ্চ পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন—

আপনার পত্র পাইয়াছি। অনেক অনুসন্ধানে কুসুমের হস্তলিখিত পদ্য যাহা কিছু পাইলাম, তাহা অদ্য বুকপোষ্টে আপনার নিকট পাঠাইলাম। আর তাহার হস্ত-লিখিত পদ্য বা গদ্য কোন প্রবন্ধ নাই। আমি কি লিখিব? কুসুমের সঙ্গে সঙ্গে আমার এ জীবনের শান্তিসুখ গিয়াছে। এ জীবনে আমি আর কোন আশা ভরসা রাখি না। আমার ভোগ শেষ না হইলে, প্রাণ বিয়োগ হইবে না জানি, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকা, কেবল অশান্তিতেই কাটাইব। ভগবান্ আমাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছেন। নানাপ্রকার পারিবারিক, বৈষয়িক ও শারীরিক অশান্তিতে কাল কাটাইতেছি। আমার সে দিন আর নাই, হইবেও না।

১৪ই ফাল্গুণ জলদা লিখিয়াছে—

... ... শ্রীমতী কোন শাপে যেন স্বর্গভ্রষ্টা হইয়াছিল; শাপান্তে পুনঃ তথায় চলিয়া গিয়াছে। শ্রীমতীর পথ অনুসরণ করিবার জন্য আমাদেরও প্রস্তুত হওয়া উচিত, যেন আমরা গোলোক ধামে গিয়া অবিচ্ছেদ্য সম্মিলনে অনন্ত অনন্ত কাল যাপন করিতে পারি। শ্রীমতী তাহার জ্যেঠা, জ্যেঠিমা, পিসিমা, ভাই, ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি পরিবার লইয়া নিত্যধামে নিত্যসুখ ভোগ করিতেছে। শ্রীমতী ইহজীবনে কোনরূপ কষ্ট ভোগ করে নাই, পরলোকেও তাহার কোন কষ্ট নাই। মূঢ় আমাদেরই সুধু কষ্ট। বুঝিয়াও মনকে সময় সময় বুঝাইতে পারি না। কোথা হইতে কিসে যেন মনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ... ... কিন্তু আমাদের শ্রীমতী এই অলীক জগতের জন্ম মৃত্যু হইতে এড়াইয়া মোক্ষনামক পরমাত্মমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছে; যাহা আমাদের সকলের একমাত্র স্থান, যে স্থান প্রাপ্তির জন্য যোগিঋষিগণ যোগাসনে বসিয়া সতত হরিনাম জপ করিতেছেন।

আমাদের শ্রীমতী ধর্ম্মোপার্জ্জিত অশোচ্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে কেন মা আমরা বৃথা শোক করি? যাহাতে তথায় উপস্থিত হইতে পারি, বেলাবেলি তাহার পথ দেখি। তবে মা! এ কষ্ট সঙ্গে থাকিবে যে, অন্তিম কালে মনের সাধে শ্রীমতীকে একবার দেখিতে পারিলাম না। আর কি বলিব মা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, অন্তিম কালে একবার মনের সাধে শ্রীমতীকে চিকিৎসা করাইয়া শ্রীমতীর শুশ্রূষা করিয়া দেখিতে পারিলাম না। ... ...

২৮শে ফেব্রুয়ারি রঙ্গপুর জিলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত বাবু অঘোরনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন—

.........The sad bereavement, I should say the saddest bereavement of your only daughter, has inflicted a deep blow not only to my heart but to the heart of all your friends at Rangpur. The teachers of the school, who were acquainted with you, breathed a very deep sigh at the breaking of the sad news, and all of us prayed that Almighty Father might give you sufficient strength to bear up with fortitude the bereavement of your only daugnter—a daughter whom any man might have been proud of--so meek, so lovely, so intelligent, so kind. I shed tears, and I cannot help shedding tears now at the recollection of her. When I was suffering from tooth-ache and the pain was so acute that I became restless and could not sit quiet and teach my boys, some how or other news of my restlessness caught her notice, she sent me at once a healing balm which acted like a magic on the acute pain,—all on a sudden it extenguished, as it were, a blazing fire.

It speaks volumes of the tenderness and sympathy of a girl of 12 years—for she was not more than twelve years then—to send me the proper medicine although I did not ask for it. Whenever the teachers of your school sent the mali for fetching পান and তামাক from your house she ungrudgingly supplied them even when she was bed-ridden. She was a born poet, the effusion of her poetic genius has attracted the admiration of the most accomplished scholars. Whenever amongst us poetic genius becomes the subject of our conversation, the name of কুসুম shines brilliant in it. O কুসুম where are you now? you were a pride not to your parents only—but to our community. But brother, do not weep. Have strength to bear it up. Always turn your thought to the expression—Man proposes and God disposes. We mortal beings have nothing left to us except that it is not for us to understand the ways of God. We all perceive that this cruel blow—the cruelest of all that may befall a man in this vale of tears, will go deeper and deeper in the heart of you and your wife, yet I offer my heart-felt condolence to you and your wife.

আপনার একমাত্র কন্যার শোচনীয়তম বিয়োগে যে কেবল আমার হৃদয়ে প্রগাঢ় আঘাত লাগিয়াছে এমত নহে, রঙ্গপুরে আপনার যে সকল বন্ধু আছেন, সকলের হৃদয়েই প্রবল আঘাত লাগিয়াছে। স্কুলের যে সকল শিক্ষকের সহিত আপনার পরিচয় ছিল, এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আমরা সকলেই প্রার্থনা করিয়াছি, সর্ব্বশক্তিমান পিতা যেন আপনার একমাত্র

কন্যার বিয়োগ সহ্য করিতে শক্তি প্রদান করেন। কন্যা এমন সুশীলা, এমন লাবণ্যময়ী, এমন বুদ্ধিমতী, এমন দয়ালু যে, যে কোন লোক কেন না হৌক সে ই এমন কন্যাকে গৌরবের কারণ মনে করিত। আমি অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি এবং এখনও তাহার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন আমি দন্তশূলের যাতনা ভোগ করিতেছিলাম এবং সে শূল এতই কঠোর ছিল যে, আমি অধীর হইয়া পড়িলাম, সুস্থির ভাবে বসিতে পারিলাম না এবং বালকদিগকে পড়াইতে পারিলাম না ; কিপ্রকারে যেন সে আমার অস্থিরতার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমার জন্য বেদনা নাশক একটী ঔষধ পাঠাইয়াছিল। সে ঔষধ আমার দারুণ বেদনায় যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল—হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তখন তাহার বয়স বারবৎসরের অধিক হইবেনা এবং আমিও ঔষধ চাই নাই, এই অবস্থায় আমার জন্য ঠিক ঔষধটি প্রেরণে তাহার হৃদয়ের কোমলত্ব ও সহানুভূতি বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। যখন আপনার স্কুলের শিক্ষকগণ আপনার গৃহ হইতে পান তামাক আনিবার জন্য মালীকে পাঠাইয়াছেন, সে শয্যাশায়িনী থাকিলেও অম্লানবদনে তাহা দিয়াছে। সে কবি হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুদক্ষ বিদ্বানগণও তাহার কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যখন কবিত্ব শক্তির বিষয় আলোচিত হয়, কুসুমের নাম তখন উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিমান। হা কুসুম! তুমি এখন কোথায়? তুমি যে কেবল তোমার পিতা মাতার গৌরব ছিলে, এমন নহে, তুমি আমাদের সমাজের গৌরব ছিলে। যদিও কুসুমের নাম করিতে আমি চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু ভ্রাতঃ তুমি শোক করিও না, ভ্রাতঃ তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিও না। ইহা সহ্য করিতে শক্ত হও। মনুষ্যে কল্পনা করে, ঈশ্বর বিধান করেন,

এই বাক্য স্মরণ কর। আমরা মরণশীল মনুষ্য ; আমাদের ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বিধাতার বিধান আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সকলেই বুঝিতে পারি যে, এই নিদারুণতম আঘাত, এই শোক পূর্ণ-ধরণী-মাঝারে ক্রমশঃ আপনার ও আপনার গৃহিণীর হৃদয়ে গভীর প্রবেশ সাধন করিবে ; তথাপি আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে সহানুভূতি প্রদান করিতেছি।

১৭ই ফাল্গুণ কুসুমের ছোট মাসীমাতা বিন্দুবাসিনী লিখিয়াছে—

আপনি এত আরাধনা করিয়া এমন রত্ন পাইয়াও এত শীঘ্র হারাইলেন, ইহা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। সেই মধুর হাসিমুখখানি, সেই মধুর কথা, মধুর মাসীমা ডাক কোথায় শুনিব ?……এখন সর্ব্বদা সেই দেবী মাতা, স্নেহের মাতা কুসুম সর্ব্বদা চক্ষের উপর ভাসিয়া মন কাঁদাইতেছে।

৪ঠা মার্চ্চ পাবনা ছবজজকোর্টের পেস্‌কার জ্যোতীন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছে—

……Kusum's sweet at the same time significant words still ring in my ears. Her tender and intelligent image is still fresh in my mental view. But alas she is no longer on this earth to sweeten by her loving presence the small circle of her old parents.

কুসুমের মধুর এবং জ্ঞানবিকাশক কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে। তাহার কোমল এবং প্রতিভাশালী মূর্ত্তি এখনও আমার মানসপটে দেদীপ্যমান। কিন্তু আহা! সে আর ইহলোকে নাই। তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা তাহার প্রিয়দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

ভূপতি লিখিয়াছে—

তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্।
কূলপাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্॥ ৪৯

ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসং সর্ব্বতঃ শোককর্ষিতম্।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ॥ ৫০

উপরোক্ত শ্লোক দুইটি বুঝিবার জন্য এক দিন সন্ধ্যার পরে যোগেশ বাবুর নিকট যাই। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বুঝিতে না পারিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে থাকি। এমন সময় কুসুম নিকটবর্ত্তী টেবিলের উপরে আসিয়া বসিল ও আমাকে বলিল, "দাদা! কি করিতেছেন?" আমি বলিলাম, "এই শ্লোক দুইটি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না।" সে আমাকে এম্‌নি ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, আমি জীবনেও কখন ভুলিতে পারিব না।

ভবত্ববিধবা ভূমিঃ ত্বয়া পত্যা সমন্বিতা।
শশিনা বিমলেনৈব শারদী রজনী যথা॥ ২৬

উপরোক্ত শ্লোকটি ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া কুসুমকে বলিলাম, "কুসুম তুমি ত অসংখ্য পুস্তক পড়িয়াছ; আমাকে এই শ্লোকটি বুঝিয়ে দেও।" সে আমাকে অতি সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

এই শ্লোকটি বুঝাইবার পর আমি কখনও ইহা পড়ি নাই। পরীক্ষার পূর্ব্বে আমার মন অত্যন্ত খারাপ ছিল; কারণ আমি রামায়ণ ভাল করিয়া পড়ি নাই। পরীক্ষা গৃহে গিয়া দেখি সৌভাগ্যক্রমে ঐ শ্লোকটিই পড়িয়াছে। আমি অতি উত্তম রূপে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছি। কুসুম বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই শ্লোকটি আমার পরীক্ষায় থাকিবে; সেই জন্যই আমাকে সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল। কুসুম! আজ যদি তুমি জীবিত থাকিতে, তা হ'লে কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে।

১লা মার্চ্চ তারিখে হাজারিবাগ-বঙ্গবালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী চঞ্চলা নিয়োগী লিখিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার একমাত্র সন্তান এবং আমাদের অতিপ্রিয় শ্রীমতী কুসুম কামিনীর অসময়ে অকস্মাৎ পরলোক গমনের সংবাদ আমাদের প্রাণকে যে কিরূপ আহত করিয়াছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। এত অল্প বয়সে যে, সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু বিধাতার অনতিক্রমনীয় ব্যবস্থার অধীন হইয়া সেই স্বর্গের কুসুম পৃথিবীর বাগানে অল্পদিনের জন্য ফুটিয়াছিল এবং নিজ চরিত্রসৌরভে সকলকে মুগ্ধ করিয়া সেই স্বর্গের কুসুম পৃথিবীর বাগান পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া ফুটিয়াছে।

আমি শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সেই জীবনের দুই একটি কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতেছি। কুসুমের জীবন অতি পবিত্র ছিল। কুসুমের জীবনের সেই দুই এক বৎসর আমার সঙ্গে যাহা জানা শুনা হইয়াছিল, তাহারই সম্বন্ধে কিছু লিখিবার মনস্থ করিয়াছি।

প্রথম যখন কুসুমকে দেখি, তখনই তাঁহার সুমিষ্ট জীবন আমার প্রাণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রথম পরিচয়ে আমি জানিতাম না যে, সে আমার অতি নিকট আত্মীয়া; তথাপি আমি তাহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতাম এবং সেও আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত যে সম্পর্ক, জানিতে পারিলাম এবং সর্ব্বদা সে আমাদের বাড়ীতে আসিবার খুব ইচ্ছা প্রকাশ করিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে উপাসনাদিতে যোগ দেওয়াতে আরও বিশেষরূপে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার গভীর অনুরাগ ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু সে স্পষ্ট করিয়া কখনও আমাকে কিছু বলে নাই। কয়েক দিন পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, তাহাতেই তাহার মনের ভাব ব্যক্ত হইল।

একদিন কুসুম আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আইসে। সেই দিনই আর একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রমহিলাও বেড়াইতে আইসেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর সেই হিন্দুস্থানী মহিলাটি আমায় বলেন, "আপনাদের ধর্ম্মের সকল ভাল; আপনারা ব্রাহ্মণকে মানেন না, সেইটা কেমন কেমন লাগে।" আমি এ বিষয়ে তর্ক যুক্তি দিয়ে তাঁহাকে বেশী বুঝাইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করি নাই; কিন্তু কুসুম তাহার উত্তর সেই মহিলাটিকে বলিলেন, "এক ঈশ্বরই আমাদের পূজনীয়; তাঁর সম্মান যিনি করেন, তিনিই সকলের সম্মাননীয়।" এইরূপ কয়েকটি যুক্তি দ্বারা এমন সুন্দর সুমিষ্ট ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তিনি প্রত্যুত্তরে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন কিরূপে করিলে অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, সেই সম্বন্ধে আমায় সময়ে সময়ে সে প্রশ্ন করিত এবং আমাদের বইয়ের আলমারী হইতে ঐ সম্বন্ধের অনেক বই পড়িয়াছিল। জীবনে যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার অভ্যাস তাহার একেবারেই ছিল না, বেশী কথা বলার অভ্যাস কখনও তাহার ছিল না; কিন্তু ভাবে ও ব্যবহারে ভিতরের জ্যোতি প্রকাশ হইত এবং সেই পবিত্র জ্যোতিই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রতি তাহার মৌখিক ভালবাসা ছিল না; যথার্থ প্রাণ দিয়াই ভাল বাসিত। তাহা তাহার পরলোক গমনের পর আরও ভাল করিয়া বুঝিলাম।

ইহলোক পরিত্যাগের চারিমাস পূর্ব্বে কুসুম যখন শ্বশুরালয়ে যান যাইবার পূর্ব্ব দিন আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে আমাদের বাটী হইতে লইয়া গিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিল এবং সে পৃথিবীতে যে, বেশী দিন থাকিবে না, তাহাও তাহার নিকট বলিয়াছিল। আমার ছোট মেয়ে

চার বৎসরের মাত্র। কুসুমের মা কাঁদিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া সেও উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং বাটী আসিয়া আমাকে বলিল, "মা! কুসুম দিদি কি আর আসিবেন না? তিনি আমাদের বড়ই ভাল বাসিতেন; বাগান থেকে কত ফুল তুলে আমাদের দিতেন।" ইত্যাদি তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। এত ছোট চার বৎসরের শিশু তাহার ভালবাসাতে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল। অকৃত্রিম ভাল-বাসাতে কেমন করিয়া মুগ্ধ করিতে হয়, কুসুমের জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কুসুম আপনাদের একমাত্র সন্তান ছিল; তাহার গমনে আপনাদের গৃহ চিরশোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সকলের মোহমায়ার পাশ ছিন্ন করিয়া তাহার মহাপ্রস্থানে আপনাদের জীবনের যে স্থান শূন্য হইয়াছে, পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যে, সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে। যিনি শোকের আগুণ জ্বালিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই উহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না। তাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহারই দিকে তাকান ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। কুসুমের জীবন ধর্ম্ম-প্রাণ ছিল। সুতরাং সে এই রোগ দুঃখশোকপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া এখন সেই বিশ্বাসীদিগের চিরবিশ্রামস্থান অনন্তশান্তি ও আনন্দ লোকে বাস করিতেছে এবং আমাদের জন্য পরম জননীর গৃহে স্থান প্রস্তুত করিতেছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এখন আমরা শোকাশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া, কুসুমের সুন্দর জীবনের অনুকরণ করিয়া সেই লোকের জন্য প্রস্তুত হই এবং স্বর্গবাসিনী সেই কুসুমের দিকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বাসপূর্ণ প্রাণে বলি—

যাও রে অনন্ত ধামে, মোহমায়া পাশরি, দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।

জরা নাহি মরণ নাহি, শোক নাহি, যে লোকে, কেবলই আনন্দ-স্রোত চলিছে প্রবাহি।

যাও রে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে, অমরগণে লইবে তোমায় উদার প্রাণে।

দেবঋষি রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে, ধ্যানভরে গান করে একতানে।

যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে, শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য কিরণে।

যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত পুণ্যবান্, যাও বৎসে, যাও সেই দেব-সদনে।

৯ই মার্চ্চ ভূতপূর্ব্ব পুলিষ ইন্‌স্পেক্টর বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র বসুর স্ত্রী লিখিয়াছেন—

......মা তুমি আমায় যাহা লিখিতে অনুরোধ করেছ, আমি কি সে মধুর জীবন লিখিতে সক্ষম হইব? আমার যে কোন বিষয় লেখা অভ্যাস নাই, তাহা তুমি জান। যাহার নাম করিতেও মুখ মনে করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাহার কথা ভাবিতে চক্ষের জলে বুক ভাসে, তাহার কথা আমি কি লিখিব? যখন ভাবি, সেই স্নেহের ধনকে এ পৃথিবী হইতে হারায়ে তার মা ও বাবা কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন, তখন মনে হয়, সেই ব্যথিতস্থানে আর ঔষধ দিবার পৃথিবীতে কেহ নাই। দয়াময় দেবতা তাঁদের শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবিধান করুন ও তিনিই তাঁদের শূন্যস্থানকে পূর্ণ করুন। তাঁরই কি মঙ্গল অভিপ্রায় আছে, তিনিই জানেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কুসুম স্বর্গের কুসুম বলিয়া এখন যথার্থ বুঝিতেছি। দুদিনের জন্য আপনার সুগন্ধ ছড়ায়ে পৃথিবী হইতে যেখানকার কুসুম সেইখানেই শোভিত হইলেন।

কুসুম-জীবনের সুন্দর ভাব আমার মত লোকে কখন লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। তবে সাধ্বী কুসুমের সুন্দর ব্যবহারে অনেক সময় যে আমাদিগকে মোহিত করেছে, তাই দুটা কথা তোমাদের কাছে বলি। প্রিয়দর্শন কুসুম নিজগুণে সকলের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁহাকে যিনি একবার দেখিয়াছেন ও আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। কুসুম অত্যন্ত সরল এবং শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। তিনি যাহা ভাল কাজ বলিয়া বুঝিতেন, তাহা নিজে করিবার ও শিখিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিতেন। ব্রহ্মসঙ্গীত শিখিবার জন্য তাঁর কত যত্ন ছিল। আমি ভাল গান করিতে পারি না, তবু আমার নিকট গান শুনিতে কত যে ভাল বাসিতেন, তাহা যেন আমি এখন দেখিতেছি। পূর্ব্বে তিনি কখন প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁর মেশো মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট মানুষের আত্মার অভাবের কথা জানান উচিত এবং সরল বিশ্বাসে যখন বুঝিলেন যে, মানুষের অভাব ভগবান্ ভিন্ন কেহ পূরণ করিতে পারে না, সেই দিন হইতে কুসুম প্রত্যহ প্রাতে প্রার্থনা করিতেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁর একটা টান আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছি। প্রতি শনিবারে সঙ্গতে আসিতেন ও যে দিন যে সকল বিষয়ের কথা হইত, সেই সকল কথা পুনরায় বাটী গিয়ে ভাল করে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন, ও যে দিন সঙ্গতে কোন কারণে যদি যাইতে না পারিতেন, তবে সে জন্য অত্যন্ত প্রাণে কষ্ট অনুভব করিতেন এবং সঙ্গতে কি বিষয় আলোচনা হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া যাহাতে সেইরূপ মেয়ে হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেন। তিনি বড় পিতৃভক্ত কন্যা ছিলেন। একটী ঘটনায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এক দিন আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম যে, তোমার মাটির ঠাকুরকে কি করিয়া ঈশ্বর বলিতে ইচ্ছা হয়? সেই কথায় আমায় সরলভাবে উত্তর দিলেন। আমাকে বুঝাইলেন যে আমরা যে মাটির দেবতাকে ঈশ্বর বলি তাহা নয়, তবে বাবা বলিয়া দিয়াছেন, ঐ মাটির মূর্ত্তিতে ঈশ্বরকে আহ্বান করি।......এইরূপ কত সময় কত কথা স্নেহের কুসুম সরলভাবে বলিতেন, তাহা তখন আমি অমনি শুনিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাহার ভিতর যে কুসুমজীবনের বীজ ছড়ান হইত, তাহা ভাবি নাই। সেই জন্য সকল কথা স্মরণ নাই এবং তখন সে সকল কথার মূল্য বুঝি নাই। ব্রাহ্মসমাজের রীতি নীতি তাঁর বড় ভাল লাগিত। সেই রীতির অনুসরণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন।

শিল্পকাজে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। গৃহস্থালী কাজ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রায় আমার নিকটে নানা রকম কাজ করিয়া তাহা শিখিতেন। ভাল মেয়ে হই, ইহা তাঁর আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা, ছিল। পৃথিবীতে তিনি কেবল ভাল মেয়ে হইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু স্বর্গে ভাল মেয়ে ও ভাল মা হইয়া চিরদিন থাকিবেন। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে, পদে পদে তাহাই দেখিতেছি।

৪ঠা এপ্রিল বগুড়ার পুলিষ সব ইন্‌স্পেক্টর বাবু রেবতীমোহন ঘোষ লিখিয়াছেন—

......কুসুমের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যে কতদূর দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সংবাদ যদিও আমি পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার নিকট এ বিষয় আমি কিছু লিখিতে সাহসী হই নাই। আপনার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হারাইয়া আপনি যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহার সীমা নাই। ঈশ্বর আপনাকে এত কষ্টে ফেলিবেন, ইহা কখনও মনে হয় নাই। কুসুম যে আমাকে কত ভাল বাসিত, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সে আমার প্রতি

যেরূপ ব্যবহার করিত, তাহা বাস্তবিক আন্তরিক ভালবাসা না থাকিলে হইতে পারে না। আমার বগুড়া আইসা হইতে তাহার সঙ্গে আমার নানারূপ সদালাপ হইয়াছিল। আমার স্মরণ হয় তখন তাহার বয়স সবে মাত্র নয় বৎসর হইয়াছিল। এত অল্প বয়সে সে যে সকল সৎ পরামর্শের কথা আমাকে বলিত, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি কাছারী হইতে আইসার সময় হইলে, কুসুম বাহিরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করিত। আমি কাছারী হইতে আসিলে আমার মুখ মলিন দেখিলে কত যে কষ্ট অনুভব করিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার কোনরূপ অসুখ হইলে কুসুম মনে করিত, তাহার নিজের অসুখ হইয়াছে। এই বালিকা বয়সে এরূপ দয়া খেলা ঈশ্বর দত্ত গুণ বলিয়া বোধ হয়।

কুসুমের কবিতা রচনা সম্বন্ধে আমি নিজে কিছুই বলিব না। কুসুম আমার নিকট বসিয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিল, সেই টুকু আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। অনেক তল্লাসের পর পাইলাম, এবং নিম্নে লিপি করিলাম—

চাঁদের আলো, দেখ্‌তে ভালো,
চোক জুড়ায়ে যায়।
অতি সাধে, দুপুর রেতে,
চকোর সুধা খায়॥

কুসুম চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আচরণ আমার অন্তর হইতে চলিয়া যায় নাই। তাহার কার্য্য কলাপ আমার সর্ব্বদা মনে আছে ও থাকিবে।......

২০শা চৈত্র পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন—

......কুসুমের চরিত্র ও ব্যবহারের কথা কি লিখিব? আমা-

দিগকে যেরূপ নৈরাশ্যে ফেলাইয়া হতাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা অন্যে কি বুঝিবে? আপনার একমাত্র কন্যা; অন্য সন্তানাদি নাই; আপনাদের মনোকষ্ট না হয়, এই জন্য বিবাহের পর আমার এখানে অধিক না রাখিয়া অধিকাংশ সময় আপনার নিকট রাখিয়াছি। যে সময় আমাদের এখানে থাকিত, সে সময় সর্ব্বদা আমাদিগের কোনরূপ কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিত। সংসারের কার্য্যে যদিও তাহাকে লিপ্ত হইতে হইত না, তথাপি যেরূপ আভাস পাইয়াছি, তাহাতে ভবিষ্যতে সে বাঁচিয়া থাকিলে যে অতি পরিপাটী রূপে সর্ব্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার চালাইতে পারিত, তাহার কোন সংশয় ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে কুসুম আমার গৃহলক্ষ্মীই ছিল এবং তাহার মৃত্যুতে আমি যে অশান্তি ভোগ করিতেছি ও মনোকষ্ট পাইতেছি, তাহা ভগবানই জানেন। ছোট বড় সকলের আদেশ পালনেই সে তৎপর ছিল। রুগ্ন শয্যাতেও নিষেধ স্বত্বেও যতটুকু পারিয়াছে, আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। আমি তাহার সুখ সম্পাদন কিছুই করিতে পারিলাম না। ভগবান অকালেই তাহাকে আমাদিগহইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

৭ই এপ্রিল ভাগলপুর স্কুলের শিক্ষক সতীশবাবুর স্ত্রী লিখিয়াছেন—

......স্নেহের ভগিনী কুসুমের স্বর্গগমনের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত আছি। আহা সে স্বর্গের আধফুটন্ত পারিজাত; সেইজন্য এই মায়াময় সংসার হইতে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই দয়াময়ী জননী তাহাকে নিজের স্নেহময় ক্রোড়ে লইয়া গিয়াছেন।

১৫ই মে হাজারিবাগ হইতে মিস হেরিয়েট এ বিল লিখিয়াছেন—

I had the pleasure of visiting Kusum Kamini for sometime, and it was with very great regret that I

learned of her death. I used to give her lessons in fancy needle work, and she proved herself a most apt pupil. I was often struck with the quickness and intelligence with which she grasped any explanation about the patterns of the work, and I seldom had to tell her anything twice.

Besides her natural cleverness she had a very sweet and gentle disposition and most winning manners. As I write, her bright face and pleasant smile rise up before me, and I fancy I can see her standing on the verandah to welcome me as she used to do.

Kusum and I devoted part of our time together to Bible reading. She could read it quite well in English and used to translate, as she read, into Bengali. She left Hazaribagh a few months before her death to go to her house in Dacca. I was looking forward to her return and to resuming our studies together, but God willed it otherwise.

কুসুম-কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করার সুখ আমি কতক কাল ভোগ করিয়াছি এবং তাহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছি। আমি তাহাকে মনোহর সূচিকর্ম্মে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলাম এবং সে উপযুক্ত শিষ্যা হইয়াছিল। নানাবিধ আদর্শের উপদেশ সে যেরূপ সত্বর এবং বুদ্ধিসহকারে আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহাতে আমি অনেক সময় বিস্মিত হইয়াছি এবং কদাচিৎ তাহাকে কোন বিষয় দুইবার বলিতে হইয়াছে।

স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবও অতি মধুর এবং নম্র ছিল এবং ব্যবহার অতীব মনোহর ছিল। আমি যেমন লিখিতেছি

তাহার উজ্জ্বল মুখ ও মধুর হাসি আমার সমক্ষে উদিত হইতেছে এবং আমার কল্পনায় আমি দেখিতে পারি, সে সর্ব্বদা যেমন আমাকে সাদরে গ্রহণ করিত সেইপ্রকার সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য সে যেন বারিন্দায় দাঁড়াইয়াছে।

কুসুম এবং আমি এক সঙ্গে কতক সময় বাইবল পাঠে নিয়োজিত করিতাম। সে ইহা ইংরেজিতে বেশ পড়িতে পারিত এবং পড়িবার সময় বাঙ্গালায় অনুবাদ করিত।

তাহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে সে তাহার ঢাকাস্থ বাড়ী যাইবার জন্য হাজারিবাগ ছাড়িয়া যায় এবং আমি তাহার পুনরাগমন এবং আমাদের অধ্যয়ন পুনঃ আরম্ভের প্রতীক্ষায় ছিলাম; কিন্তু ঈশ্বর অন্যরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১৮ই মে রাসমোহন লিখিয়াছে—

......ভূপতির মুখে শুনিলাম যে, কুসুমের জীবনের ভার একটি গ্রাম্য কবিরাজের হাতে ছিল। কুসুম মরিবে বলিয়াই এইবার আপনার কাছছাড়া হইয়াছিল। কুসুমের ধন জন থাকিতে একটি দুঃখিনীর মেয়ের ন্যায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইয়াছে, এই দুঃখ সহ্য করা দুরূহ ব্যাপার। জীবন থাকিতে এই দুঃখ মন হইতে যাইবে না। আমাদের হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন। নতুবা আমরা এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি। কুসুমকে যদি যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইতে না পারিতাম, তবে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। কিন্তু এই দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।......অভিমন্যুর মৃত্যু অন্যায় প্রকারে হইয়াছিল এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ছিল যে, অভিমন্যুর মৃত্যু হউক। যখন যুদ্ধে অভিমন্যু পিতা পিতা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তখন পাছে অর্জ্জুন তাহার ডাক শুনিয়া সেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়, এই মনে করিয়া

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনবরত শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত না। কুসুমের মৃত্যুও সেইপ্রকার। আপনার নিকটে থাকিলে কুসুমের মৃত্যু হইবে না, এই ভাবিয়া ভগবান্ পূর্ব্বেই আপনার নিকট হইতে কুসুমকে আবিধারা নিয়াছিলেন। সেই-বার কুসুমকে মৃত্যুমুখ হইতে আপনি টানিয়া রাখিয়া ছিলেন। এইবার আপনি সম্মুখে থাকিলে ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত না বলিয়াই সে আবিধারা গিয়াছিল।......

২৭শে মে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছে—

কুসুম শান্ত নম্র মিষ্টভাষিণী এবং পরোপকারিণী ছিল। পরনিন্দা তাহার মুখে কখনও শুনা যাইত না। তাহাকে নিষ্ঠুর কথা বলিতে কিম্বা হিংসা করিতে কখনও দেখা যাইত না। শিশুকাল হইতেই কুসুম ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িতে বড় ভালবাসিত এবং কবিতা রচনা করিত। কুসুমের কতকগুলি অলৌকিক গুণ ছিল, যাহাতে তাহাকে দেবী বলিয়া বোধ হয়। গত পূজার সময় আমি এক দিন কতক টাকার জন্য বড়ই বিপদে পড়িলাম। সেই সময় মামার হাতে টাকা ছিল না। কি করি, কোথা হইতে টাকার কাজ চালাই, অনবরত তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় কুসুম আসিয়া বলিল, "রাঙ্গাদাদা! ভাবেন কেন? আমি আমার গহনা দিতেছি, আপনি গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকার কাজ চালান।" এই বলিয়া কুসুম আমাকে এক ছড়া সোণার পাঁচ লহর আনিয়া দিল। আমি সেই জিনিস বন্ধক রাখিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। কুসুমের এত দয়া দেখিয়া ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলাম। পৌষ মাসের মধ্যভাগে কুসুমের ব্যারামের সংবাদ জানিয়া মাতুলানী ঠাকুরাণীকে নিয়া ২৭শে তারিখে বাড়ী রওয়ানা হইলাম। ৩০শে তারিখে বাড়ী পৌছিয়া ৩রা মাঘ তারিখে কুসুমের শ্বশুর বাড়ী

আবিধারা রওয়ানা হইলাম। সেখানে যাইয়া কুসুমকে দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। কুসুমও আমাকে দেখিয়া হাতে চাঁদ পাইল। কিন্তু কুসুমকে শয্যাগত দেখিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কুসুম শয্যাগত থাকিয়াও আমার আবিধারা যাইবার পর দিন আমার পরিবার ধুতি ও গামছা দেখাইয়া দিল এবং আমার আহারাদি ভালরূপ হইল কি না জিজ্ঞাসা করিল। ৮ই মাঘ ভোর বেলা হইতে কুসুমের অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। অনেক ঔষধ খাওয়াইলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ঔষধেই কাজ করিল না। বেলা আড়াইটার সময় কুসুমের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া কুসুমকে সকলে বাহিরে আনিল। কুসুম বাহিরে আসিয়া একবার চক্ষু মেলিয়া স্বর্গের শোভা দর্শন করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেল। তখনও তাহার শরীরে লাবণ্য ছিল এবং সেই সময় কুসুমের শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইল। আমি ও সুরেশ বাবু (তাঐ মহাশয়) সেই শোভা কিছুকাল দর্শন করিলাম। তৎপর আর কুসুমের দিকে তাকাইবার শক্তি রহিল না। অনবরত চক্ষের জলে বুক ভাসিতে আরম্ভ করিল। ১৪ বৎসর ৬মাস ৭দিনে কুসুমের মানবলীলা শেষ হইল। এই পৃথিবীতে তাহার নির্ম্মল শুদ্ধ চরিত্র চিরস্মরণীয় রহিল। যাও ভগ্নি! যেখানে শোক দুঃখ নাই, সেই অনন্তধামে যাইয়া আমাদের জন্য স্থান রাখিও। হে ভগবন্! তোমার ধন তুমি মাতৃক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইলে; কিন্তু বৃদ্ধ শোকাতুর জনক জননী যে আজ কুসুমরত্ন অভাবে কত যাতনা ভোগ করিতেছেন। হে অন্তর্য্যামিন্! অন্তরের ব্যথা সকলই জান। তাঁহাদের এত যাতনা দেখিয়া কি তোমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে না? দয়াময় তুমি দয়া করিয়া আমাদের সংসারে এমন একটি সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত করিলে, আবার অকালে সেই সুন্দর পুষ্প ঝড়াইলে কেন? কয়েক

দিনের জন্য স্বর্গের কুসুম মর্ত্তে পাঠাইয়া মাতৃক্রোড় সুশোভিত করিলে আবার এমন নিষ্ঠুর হইয়া সেই রত্নটি কাড়িয়া লইয়া সে ক্রোড় শূন্য করিলে কেন ? হে ভগবন্! তুমি এই পৃথিবী হইতে সুকোমল পুষ্পটি ঝড়াইয়া লইয়া স্বর্গের কোন উদ্যানে রোপিত করিয়াছ। না জানি সেই সুন্দর পুষ্পটি এখন স্বর্গে কতই শোভা পাইতেছে। এরত্ন স্বর্গেরই উপযুক্ত। ধূলি কর্দ্দমময় পৃথিবীতে কি এমন রত্ন থাকিতে পারে ? হে মঙ্গলময়! তুমি যখন যাহা কর, আমাদের মঙ্গলজন্যই করিয়া থাক। আমরা অজ্ঞান ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি ; তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই শোকে অস্থির থাকি। দয়াময়! তোমার ধন তুমিই লইয়াছ। এখন কেবল আমরা তোমার নিকট একটি ভিক্ষা চাই একবার আমাদিগকে সেই স্বর্গীয় শোভা দর্শন করাও। আমরা ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের শোভা দর্শন করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাই।

কুসুম কামিনীর জননীর উক্তি।

আমার কন্যা কুসুম-কামিনী ভূমিষ্ঠা হইয়া কাঁদে নাই এবং মৃত্যু সময়েও চক্ষের জল ফেলে নাই। আট নয় মাস বয়সের সময় হইতে বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করে নাই। কোন ব্যারামে কখনও তাহার মুখে দুর্গন্ধ হয় নাই। পদ্মিনী নারীর সমস্ত লক্ষণই তাহাতে ছিল। সে সুকেশী ছিল। তাহার মুখখানা পদ্মের মত, নাসা লক্ষ্মীনাসা এবং কর্ণ ও নয়ন অতীব সুন্দর এবং দন্তপাটি ঠিক যেন মুক্তা গাথা ছিল। দুই হাতে দুইটি পদ্ম এবং সকল অবস্থাতেই মুখখানা জ্যোতির্ম্ময় ও সহাস্য ছিল। তাহার পায়ের তলা একেবারে সমান ছিল। সে গজেন্দ্র গামিনী ছিল। ব্যারামের সময়েও তাহার মুখ পরিষ্কার থাকিত। তাহার অধর, ওষ্ঠ এবং জিহ্বা অতি পাতলা এবং লাল ছিল। তাহার গঠন অতি সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ মাখনের মত কোমল

ছিল। মৃত্যুর অতি অল্প সময় পূর্ব্বেও সে ঈষৎ হাসিয়াছিল। মৃত্যুর পর যখন তাহার কপালে সিন্দূর দেওয়া হইয়াছিল, তখন এক অপূর্ব্ব শোভা দেখা গেল। তাহার মৃত্যুর পর আমি তাহাকে বুকে করিয়া শুইয়াছিলাম। তখনও তাহার সর্ব্বাঙ্গ মাখনের মত কোমল ছিল। তাহার শাশুড়ী বলিল, "বৃহস্পতিবার আমার গৃহলক্ষ্মী গেল, চক্ষের জলত ফেল্‌ল না, মায়া ত ত্যাগ কর্‌ল না।" তাহার পর আমি শুনিতে পাইলাম, শ্মশান ভূমিতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ কোমল ছিল। সে আমাকে আমার মা'র মত অনেক গৃহকার্য্য শিক্ষা দিয়াছে, এবং নানাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছে। মৃত্যু পর্য্যন্ত জিহ্বা লাল এবং দন্তগুলি পরিষ্কার দেখিয়াছি।

কুসুমের দেহান্তরের পর পূর্ণবাবু অত্যন্ত বিলাপ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি মুখাগ্নি করিবার পর শ্মশানে ঝাপ দিতে চাহিয়াছিলেন এবং সমস্ত রজনী অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। আমি আবিধারা হইতে কামারগাঁ আসিবার সময় তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সুরেশ এবং তারক বসু সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছিল। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সরদার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এমন বৌ আর হবেনা, আমি বৌ দেখিয়া আনিয়াছিলাম।" বাটীর অন্যান্য ভৃত্যগণও ক্রন্দন করিয়াছিল।

কুসুম-কামিনী যখন হাজারিবাগ ছিল, তখন সে ভিক্ষুক দিগকে চাউল এবং মধ্যে মধ্যে পয়সা দিত। এক দিবস একটি বৃদ্ধা ভিখারিণীকে ছাতু ও গুড় খাওয়াইয়াছিল। কুসুমের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরে সেই ভিখারিণী ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিল। যখন সে কুসুমের পরলোক গমনের সংবাদ শুনিল, অমনি চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "পুটি মাইয়া হাম্‌কো ছাতু গুড় খিলায়া।"

এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এখন শুনিতে পাই, বৃদ্ধা তাহার অল্পদিন পরেই তনুত্যাগ করিয়াছে।

বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার মার্টিন সাহেবের কন্যা ৩০শে মে রাঁচি হইতে লিখিয়াছেন।

I was extremely sorry to hear from Miss Roe of the death of your daughter, and I am sure it must be a deep sorrow to you......I well remember hearing your daughter reciting, and although I do not know Bengali, from your translation of the pieces she wrote I was able to recognize the poetry of her composition.

মিস্‌রোর পত্রে আপনার কন্যার মৃত্যু সংবাদ জানিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নিশ্চয়ই ইহা আপনার গভীর শোকজনক। আপনার কন্যা যে মুখস্ত কবিতা বলিয়াছিল, তাহা আমার বেশ মনে আছে এবং যদিও আমি বাঙ্গালা জানিনা, তথাপি আপনাকর্ত্তৃক তাহার রচিত কবিতার অনুবাদ হইতে আমি তাহার রচনার মাধুরী বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কুসুমের মাতুল উলুবেড়ের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কুমুদিনীকান্ত রায় ১৩ই জুলাই লিখিয়াছেন।

......আমার সহিত তাহার (কুসুমের) অতি অল্প সময়ই দেখা হইয়াছে। বিশেষ ইদানীং আমার স্মৃতিশক্তিও তত প্রখর না থাকায় অধিকাংশ কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। যে স্বপ্ন দেখিয়া মনে খুব আহ্লাদ হয়, প্রায়ই তাহা স্বপ্নান্তে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। শত চেষ্টাতেও সে সব কথা মনে আসে না। আমারও কতকটা তাই হইয়াছে। আমার সহিত শেষ বারে আমাদের বাটীতে যে দেখা হয়, সেইবারকার বৃত্তান্ত আমার কিছু কিছু স্মরণ

আছে। কুসুমের জীবন বাস্তবিকই আমার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। একবার আমাদের বাটীতে আমার একটী আত্মীয়া বেড়াইতে আসিয়া ছিলেন। তিনি কুসুমের কবিতা রচনা পটুতার বিষয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কুসুমের বয়স ও আকৃতি দর্শনে তাঁহার যেন সে বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার সাক্ষাতে কিছু রচনা করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। আমি কুসুমকে আমার সেই আত্মীয়ার রূপ বর্ণনা করিতে বলি। কুসুম তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করে।

নলিনীর মুখরুচি,　　হেরি দুঃখ গেল ঘুচি,
ধরাগেল আকাশের চাঁদ।

ইত্যাদি—

আমার সেই আত্মীয়ার নাম নলিনী। বলা বাহুল্য যে সেই রচনা সম্পূর্ণরূপে সেই বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী হইয়াছিল এবং আমরা সকলেই তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই কুসুমের কথা নিয়া আন্দোলন করিতাম ও তাহাতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতাম। ৺কালীকুমার রায় দাদা মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তোমরা সকলে যখন ইহাকে ভাল বাস, তখন কুসুম দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে না। তাঁহার সেই কথা হাতে হাতে ফলিয়াছে।

সমাপ্ত।